অর্ঘ্য

(ছোট-গল্প)

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা

১৯১৭

মূল্য ৷৷০ মাত্র।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং হইতে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ২৫।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
চেরি প্রেস লিমিটেড হইতে
শ্রীতুলসীচরণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

অর্ঘ্যের কয়েকটী গল্প ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; অবশিষ্ট গল্পগুলি নূতন।

সুখের কথা এই যে এই গল্প-সংগ্রহের মধ্যে 'মনের মতন' নামক গল্পটী এবং আরও কয়েকটী গল্প ধারয়ায় জেলার এনিপারী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কে, জি, ইনামতি কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। 'ডালি'র কয়েকটী গল্পও উক্ত মহাশয় অনুবাদ করিতেছেন।

উত্তরপাড়া
২রা ফাল্গুণ ১৩২৩

বিনীত
গ্রন্থকার।

অর্ঘ্য।

মায়ের প্রাণ।

[১]

রাণীর যখন স্বামী মরিল তখন তাহার মাথা ছাপান ঋণ এবং পূর্ণ দশমাস গর্ভ; ভগবান যেন তাহার শিরে বজ্র হানিলেন।

সৎগোপের কন্যা রাণীর বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ একহারা দেহখানিতে বেশ একটা শ্রী ও লাবণ্য ছিল; মুখখানি স্নেহ ও করুণায় ঢল ঢল।

এই কাঁচা বয়সে সে বিধবা হইয়া সংসার অন্ধকার দেখিল। তাহার স্বামী মাধব ঘোষ তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া যখন ঘরে আনিল তখন তাহার বয়স দশ বৎসর এবং মাধবের বয়স পঁয়তাল্লিশ। অনেকটা পিতা-পুত্রীর বয়সী এই নবীন দম্পতি কিন্তু তাহাতে একটুও নিরুৎসাহ হইল না। সৎশিক্ষার গুণে রাণী তাহার প্রৌঢ় স্বামীকেই ভয় ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল; প্রেম জিনিসটা তখনও তাহার হৃদয়ের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া মুদি মাধব কিন্তু অনেক অধিক স্ত্রৈণ হইয়া উঠিল, কারণ লোকের নিকট সে বলিত,—"ছেলে-

মানুষ বৌ, এই বয়সেই মা খেয়েছে, আদর যত্ন ত' আর অভাগী পায়নি!" এবং এই ওজুহাতে সে সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের সওদা করা বন্ধ করিয়া আপন কুটীরাভিমুখী হইত।

ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহ ও বালিকার বিরক্তির মধ্য দিয়া এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর নদীর স্রোতের মতই দ্রুত ও একটানা বহিয়া গিয়াছে; মাধবের নিকট সময়টা যেন বড় বেশী দ্রুত বহিয়া গিয়াছিল,—কারণ বাসনা তখনও তাহার অতৃপ্ত এবং দিন অতীতপ্রায়। এমনি অতৃপ্তির আগুন বুকে লইয়াই মাধবকে পরলোকের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল;—স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পায় নাই। বোধহয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে দশ বৎসরের একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার এই যৌবন উদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় তাহার এই পাণি পীড়ন ব্যাপারের জন্য বেচারার মনে একটু অনুশোচনাও জাগিয়াছিল।

কাজ একটা করিবার সময় আমরা তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখি না কিন্তু তাহা হইতে কুফল ফলিলে শেষে আমরা সে জন্য অনুশোচনা করি—ইহাই জগতের চিরন্তন নিয়ম! মাধবের মনে অনুশোচনা বা দুশ্চিন্তা যাহাই হউক না কেন রাণীর কিন্তু তাহাতে বড় একটা কিছু যায় আসে নাই;—বিধবা তাহাকে হইতেই হইবে—তাহা ব্যতীত উপায় ছিল না।

যাহা হউক, স্বামীর সৎকার কোনরূপে সারিয়া আসিয়াই সে কুটীরের মাটির মেঝেয় পড়িয়া তাহার স্নেহময় প্রৌঢ় স্বামীর জন্য

অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল; কি যে তাহার কর্ত্তব্য তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না।

বেচারা কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া কাঁদিবার অবসরও অধিকক্ষণ পাইল না; দুই তিনজন পাওনাদার আসিয়া তাহার দাওয়ায় জাঁকিয়া বসিল এবং বলিয়া দিল যতক্ষণ তাহাদের প্রাপ্য টাকার একটা বিধি-ব্যবস্থা না হইতেছে ততক্ষণ তাহারা কোন মতেই দাওয়া ছাড়িয়া উঠিবে না;—কথা শুনিয়া রাণী মনে মনে প্রমাদ গণিল।

মহাজনদিগের প্রাপ্যের হিসাব করিয়া রাণী দেখিল তাহা-দিগের প্রাপ্য মোট ৪৫৬৶১০ টাকা মাত্র; কিন্তু যাহার একটা পয়সার সংস্থান নাই সে এতগুলা টাকা দেয় কোথা হইতে?

বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর পাড়ার দুই একজন সহৃদয় বৃদ্ধের মধ্যস্থতায় স্থির হইল যে মহাজনগণ মাধবের দোকান ও বসত বাটীখানি লইয়াই তাহার বিধবা পত্নীকে এ যাত্রায় স্বামীর ঋণ হইতে মুক্তি দান করিবে।

কাজে ও কথায় তাহারা ঠিক রাখিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে যাওবা মাথা গুঁজিবার রাণীর একটা স্থান ছিল, পাঁচজনের মধ্যস্থতায় তাহাও হারাইয়া সে পথে আসিয়া দাড়াইল।

এখন করা যায় কি?

রাণী যখন কর্ত্তব্য চিন্তায় নিমগ্ন সেই সময় পাড়ার দুই একজন অসচ্চরিত্র যুবক স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই তাহাকে আশ্রয় দান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। রাণী কিন্তু তাহাদের মুখ-দর্পণে

প্রতিবিম্বিত প্রাণের ভাষা অধ্যয়ন করিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ ঘৃণার সহিত তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তাহারপর সে স্থির করিল ভগবান যখন এখনও তাহাতে যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্যের স্থিতি করিয়াছেন তখন সে ভগবানের এইদান মাথায় করিয়া লইয়া আপনার গতর খাটাইয়া খাইবে, কাহারও গলগ্রহ হইয়া তাহার কলঙ্কের কারণ হইবে না।

কিন্তু বিপদ হইয়াছিল এই যে, যে গ্রামে সে এতদিন স্বাধীন ভাবেই বাস করিয়াছে সেইখানেই আজ সে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে কি করিয়া ? অনেক তর্কবিতর্কেও সে যখন মনকে কোন-মতে সম্মত করিতে পারিল না তখন অগত্যা গ্রামত্যাগ করিবেই স্থির করিল।

সেই দশবৎসর বয়স হইতে সে যেখানে বাস করিয়াছে সেই স্নেহ-প্রীতি মাখা, স্বামী-স্মৃতি বিজড়িত গ্রামখানি ত্যাগ করিতে তাহার প্রাণের মধ্যে যথেষ্ট কষ্ট হইলেও আজ এই বিপদে নিঃস্ব অবস্থায় বাধ্য হইয়া সে স্থান হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইল। বুকের অশ্রু বুকে চাপিয়াই সে পথে বাহির হইল।

দীর্ঘ পথ ও তীব্র রৌদ্র ; পূর্ণগর্ভা রাণী সেই জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র মাথায় লইয়াই মাঠের পর মাঠ পার হইতে ছিল। একটা বৃক্ষ-তলে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিয়া সে কিঞ্চিৎ জলপান করিবার মানসে নত হইবা মাত্রই একটা তীব্র বেদনা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ব্যথা অনুভব করিয়াই সে চকিত হইয়া উঠিল, এই কি প্রসব বেদনা নাকি ?

প্রথম পোয়াতি সে, এ বিষয়ে কোন কিছুই তাহার জানা ছিল না; তাহার উপর এই জনহীন মাঠে যদিই সে প্রসব করে এবং যদি সেই প্রসব করিবার সময়ই তাহার মৃত্যু হয়……উঃ! বাছার তবে কি গতি হইবে? হায় মা!

মৃত্যুটা তাহার নিকট যথেষ্ট লোভনীয় হইলেও সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব গর্ভস্থ সন্তানের জন্যও তাহার বুকের মধ্যে বড় কম স্নেহ পোরা ছিল না; মরণ হইলে তাহার সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইতে পারিত কিন্তু গর্ভের মধ্যে যে সন্তান রহিয়াছে শুধু তাহারই জন্য সে এখন আপনার দীর্ঘ জীবন কামনা করিল। তাহার যাহা হয় হউক, কিন্তু তাহার সন্তানের একটি কেশ যেন খসিয়া না যায়।

শীতল বটচ্ছায়ে বসিয়া সে এই সকল কথাই আলোচনা করিতেছিল। ব্যথাটা ক্রমেই যেন আরও ঘন আরও তীব্র-তর হইয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এমনি ব্যথা সহ্য করিয়া অবশেষে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। পুত্রের প্রতি চাহিতেই তাহার অন্তরের সুপ্ত মাতৃত্ব উছলিয়া উঠিল;—সুন্দর সুগঠিত পুত্রের দক্ষিণ কর-নিম্নের জটুল চিহ্ন দেখিতে দেখিতে সে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তাহারপর সে যখন চক্ষু মেলিল তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। পূর্ব্ব কথা মনে করিতে গিয়াই তাহার সর্ব্ব প্রথম মনে পড়িল পুত্রের কথা! পার্শ্বে সে পুত্রের সন্ধান করিল কিন্তু হায়, দূরে বা নিকটে সে পুত্রের কোন সন্ধানই পাইল না।

তাহার মাতৃহৃদয় ব্যথা-ব্যাকুলিত হইয়া দারুণ দুঃখে হায় হায় করিয়া উঠিল।

[২]

দীর্ঘ ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

পুত্রের ব্যর্থ অনুসন্ধানেই রাণীর এতদিন কাটিয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ সে সেই সদ্যোজাত নিবার-কণিকা-শুভ্র জটুল চিহ্নিত পুত্রের কোন সন্ধানই পায় নাই। এত দিন সন্ধান করিয়াও সে যখন তাহার কোন সংবাদই পাইল না তখন অবশেষে ভগ্ন হৃদয়ে তাহার আশা ছাড়িয়া দিল।

স্বামী হারাইয়া আজ এই পুত্র শোক আবার অন্তর মধ্যে নূতন করিয়া ব্যথার সৃজন করিল। যে পরশ পাথরের শীতল স্পর্শে সে তাহার অতৃপ্ত দগ্ধ হৃদয় শান্ত করিবে মনে করিয়াছিল সেই বিধাতার প্রথম ও শেষদান অভাগিনী আপন দগ্ধাদৃষ্টের দোষে পাইয়াই হারাইয়া ফেলিল।

আজ এই ব্যর্থতা ও নিরাশা তাহার প্রাণে নূতন করিয়া মাথা তুলিতেই তাহার মরণের সাধটাও নূতন করিয়া প্রাণে জাগিয়া উঠিল। কি হইবে এই ব্যর্থ নিষ্ফল জীবন বহন করিয়া? কিন্তু আশা তাহাকে তখনও প্রলোভিত করিতে ছিল,—"হয় ত একদিন বাছাকে খুজিয়া পাইব।"

কথাটা মনে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাহার বাঁচিবার সাধ নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। সংসারে চিরদিন যাহা ঘটে

রাণীর পক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না; আশাই জয়লাভ করিল।

প্রাণটা ধারণ এবং দুষ্ট লোকের পাপ দৃষ্টি হইতে আত্ম-রক্ষা এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই সে চাকুরী করিবে স্থির করিল।

অল্প চেষ্টাতেই সে চাকুরী পাইল;—ছেলে মানুষ করিবার কাজ। তাহার অতৃপ্ত মাতৃ-হৃদয় ঠিক এমনি একটা কার্য্য চাহিতেছিল রাণী তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই।

সুন্দর সুগৌর হৃষ্টপুষ্ট ছয় মাসের একটি ছেলের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানের ভার তাহার উপর পড়িল। জমিদার বাটীতে এই কার্য্যটা রাণী বিশেষ আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করিয়াছিল।

মানসের গায়ে সর্ব্বদাই একটা জামা ও অলঙ্কার থাকিত, রাণী একদিনও তাহাকে শূন্য দেহে দেখে নাই; শীঘ্রই কিন্তু একদিন অনাবৃত দেহে দেখিবার সুযোগ জুটিল, সঙ্গে সঙ্গে রাণী শিহরিয়া উঠিল। একটা সন্দেহ—দারুণ সন্দেহে তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল,—"এ কার ছেলে?"

গা মুছাইতে গিয়া সেদিন হঠাৎ রাণী বালকের দক্ষিণ কর নিম্নে একটী জটুল চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সন্দেহের অন্ত রহিল না। কথাটা কিন্তু অকস্মাৎ বলিবারও কোন সুযোগ বা সাহস তাহার হইল না; কি জানি সন্দেহটা যদি অমূলক হয়! তাহা হইলে ফল দাঁড়াইবে এই যে

অপমানিত ত' সে হইবেই, উপরন্তু হয় ত তাহার চাকুরীটীও যাইবে। শেষের ভয়টাই তাহাকে অধিকতর ব্যাকুল করিল। অভাগিনীর মাতৃ-হৃদয় এই কয়দিনেই যে শিশুকে কেন্দ্র করিয়া পুষ্পিত ও মঞ্জুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন এ শিশু হইতে বঞ্চিত হইলে অন্তর তাহার শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া যাইবে!—না, না, এ চিন্তাও কষ্টকর, হৃদয় বিদারক।

অন্তরে কিন্তু সন্দেহটা বেশ দৃঢ়ভাবেই বসিয়াছিল; সন্দেহের আন্দোলনে তাহার প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট অশান্তি মাথা তুলিয়া উঠিল। একটা কাহাকেও কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের অবসান করিবার জন্য তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কে এই লোক যাহাকে কথাটা জিজ্ঞাসা কবিলে আশঙ্কার ছিদ্র থাকিবে না! সন্দিগ্ধ চক্ষে সে অনুসন্ধান করিতে লাগিল;—কাহাকে প্রশ্ন করি? কে এ সন্দেহের অপনোদন করিবে?

জমিদার বাটীর পুরাতন দাসী ছিল নিস্তারিণী। তরুণীর দল তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিত; তাহাদের দেখাদেখি রাণীও তাহাকে মাসী বলিত। রাণীর মনে হইল এই প্রৌঢ়া নিস্তারিণী হয় ত ইচ্ছা করিলে তাহার সন্দেহ দূর করিতে পারে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর মানসকে ঘুম পাড়াইয়া রাণী নিস্তারিণীর কক্ষে আসিয়া বসিল; বলিল,—"কি হচ্ছে গো মাসি?"

"কে ? রাণী ! আয়, আয় বোস বাছা !"

সে তখন দুই পা মেলিয়া দিয়া পান সাজিতে ছিল। সেটা মুখে দিয়া একটু দোক্তা তাহাতে দিয়া বলিল—"তুই যে এখন এলি না ? তোর ছেলে কি ক'রছে ?"

"ছেলে এই ঘুমুল ; তাই মনে করলুম্ যাই একবার মাসীর ঘরে, দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে !"

"তা বেশ ক'রেছিস, আসবি বইকি ! আমার আর ক'দিন ? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, যে কটা দিন আছি একটু একটু আসিস বাছা !"

"আসব' বইকি মাসী !"—বলিয়া সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দুই একটা অবান্তর কথা বলিয়া সে প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা মাসি, গিন্নিমার কটি ছেলে গা ?"

নিস্তারিণী সন্দিগ্ধ নেত্রে রাণীর মুখের দিকে চাহিল। যেন সে দেখিতে চাহিতেছিল তাহার অন্তর মধ্যে কোন বিষ লুক্কায়িত আছে কিনা ! কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সে প্রশ্ন করিল,—"তার মানে ?"

"এই ইয়ে আর কি—"রাণী একটা ঢোক গিলিয়া বক্তব্যটা ঠিক করিয়া লইয়া বলিল,—"এই ক'টি ছেলেপুলে—অর্থাৎ আর কিছু হ'য়েছিল, না এই সবেধন নীলমণি ?"

"ঐ সবেধন !"

"তা আচ্ছা মাসী, গিন্নিমার একটু বেশী বয়সে ছেলে হ'য়েছে না ? প্রায় দু-কুড়ি ত' তাঁর বয়স হ'ল ?"

"হঁ্যা, অনেক ঠাকুরের দোর ধ'রে তবে ঐটী পেয়েছেন। আহা চাঁদপারা ছেলে, বেঁচেবর্ত্তে থাক বাছা, আমাদের আর কি, দেখেই সুখ!"

"তা বই কি! খাসা ছেলেটী কিন্তু!"

"হঁ্যা, যেন রাজপুত্তুর!"

"আচ্ছা মাসী একটা কিন্তু ভারি আশ্চয্যি দেখছি, ছেলেটি না বাবুর মতন না গিন্নিমার মতন, অন্য এক রকমের, কেন বল দেখি?"

"তা-আর আশ্চয্যি কি, পরের ছেলের—"বলিতে বলিতে নিস্তারিণী সহসা থামিয়া গেল।

রাণীর সমস্ত মুখখানায় একটা আগ্রহের ছায়া পড়িল, উৎসাহিত হইয়া সে বলিল,—"থেমে গেলে যে মাসী, কি ব'লছিলে বল না; পরের ছেলে? পরের ছেলে কি? মানস তবে গিন্নিমার আপন সন্তান নয়?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া নিস্তারিণী একটু বিপদে পড়িয়াছিল; আগাইবার বা পিছাইবার কোন কিছুরই উপায় নাই। আর কথাটা বলিবার জন্য তাহার রমণী-সুলভ আগ্রহ তাহাকে এই দীর্ঘ ছয়মাস কাল যে পীড়া দিয়া আসিয়াছে, সেই অশান্তির হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণীকে একান্ত আগ্রহান্বিত দেখিয়া সে বলিল,— "না, সে অনেক কথা, আর ভারি গোপনীয়।"

রাণী তাহাকে ধরিয়া বসিল,—"বলনা মাসী—আমি

কাউকে ব'লব না, তোমার দিব্যি মাসী জনপ্রাণীও একথা জানতে পারবে না।"—তাহার মনে সন্দেহটা দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল।

"ব'লছি, তুই আগে দোরটা দিয়ে দে দেখি!"

রাণী উঠিয়া দোরটা দিয়া আসিল। তাহারপর নিস্তারিণীর আর একটু কাছে বসিয়া বলিল,—"কি বল্লে মাসী, মানস বাবুর ছেলে নয়? তবে কার ছেলে?"

"না ও বাবুর ছেলে নয়, এক বামুনের ছেলে। তার বাড়ি হ'চ্ছে পশ্চিমে; কিন্তু দেখিস বাছা, এসব কথা যেন কাকে-বকেও না টের পায়!"

তাহার পর নিস্তারিণী মানসের সম্বন্ধে যাহা বলিল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই ঃ—

এক ব্রাহ্মণ একদিন এই ছেলেটীকে লইয়া আসিয়া বাবুর নিকট বলে যে তাহার স্ত্রী পুত্রটী সদ্য প্রসব করিয়াই মারা গিয়াছে। বিদেশে তাহারা স্বামী স্ত্রীতে চাকুরী করিতে আসিতেছিল, পথে এই বিপদ। এখন সে আর এই সন্তানটীকে রাখিতে চাহে না, সে শক্তি ও সামর্থ্য তাহার নাই; কিছু অর্থ পাইলেই সে সন্তানটীকে দিয়া যায়।

কথাটা গৃহিণীর কর্ণগোচর হইবামাত্র অপুত্রক গৃহিণী পুত্রটীকে বাটীর মধ্যে আনাইলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই ছেলেটীর উপর তাঁহার স্নেহ পড়িল। ব্রাহ্মণকে নগদ পাঁচশত টাকা দিয়া তিনি ছেলেটীকে গ্রহণ করিলেন। বাহিরে প্রকাশ রহিল এটী

তাঁহার আপন সন্তান। সেই ভাবেই মানস এতদিন এ সংসারে রহিয়াছে।

কথাটা শুনিয়া রাণীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এইটী তাহার সদ্যোজাত হৃত শিশু। কোন জুয়াচোর তাহাকে মৃতা জ্ঞানে মিথ্যা গল্পের রচনা করিয়া বাবুর বাটীতে তাহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। কথাটা তাহার নিকট দিনের মতই পরিষ্কার হইয়া গেলেও সাহস করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহার কারণ প্রথমতঃ কেহই সে কথা বিশ্বাস করিবে না এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাতে তাহার পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে।

দুই একটা অবান্তর কথা বলিয়া সে মাসীর নিকট বিদায় লইয়া মানসের নিকট ফিরিয়া গেল। আজ তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাহার মাতৃহৃদয়ের স্নেহের ধারা শতগুণ অধিক উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল। ঘুমন্ত শিশুকে ব্যাকুল আগ্রহে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিল। তাহার পর তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল। চিন্তাশেষে সে স্থির করিল যেমন হইয়াছে সেই মতই চলুক, কথাটা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

যুক্ত করে গললগ্নিকৃতবাসা রাণী অশ্রুসিক্ত মুখে ভগবানের উদ্দেশে বলিল,—দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, লালন পালন করিয়াই আমি মাতৃত্বের সাধ মিটাইব। পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিব না।

[৩]

মানস দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছিল।

জমিদারকে পিতা ও তাঁহার পত্নীকে সে মাতা বলিয়া জানিত। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে রাণীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। ঝি—মাত্র দাসী সে, তাহার নিকট মানস অধিকক্ষণ থাকিত না। জমিদার গৃহিণীর নিকট এবং সকালে বিকালে সদর মহলে কাটিয়া যাইত। রাণীর প্রাণের মধ্যে বেদনায় টন্ টন্ করিতে থাকিলেও মুখ ফুটিয়া তাহার কোন কথা বলা হইত না। মাত্র দাসী সে, জমিদার পুত্র মানসের উপর তাহার কি অধিকার আছে ?

সমস্তদিন হাসিয়া খেলিয়া দুরন্তপনা করিয়া বালকের দিন কাটিত। তাহার মাতা, জমিদার গৃহিনী তাহাকে আপন পুত্রের মতই স্নেহ করিতেন। মানস খেলা করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলবেষ্টন করিয়া মধুর শিশু কণ্ঠে ডাকিত,—"মা !" তাহার পর তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া একান্ত নির্ভরতার সহিত বিশ্রাম করিত।

জমিদার গৃহিণী,—"বাবা আমার !"—বলিয়া তাহার নবনীত কোমল গণ্ডে চুম্বন করিয়া তাহার ক্রীড়া জনিত শ্রান্তি অপনোদন করিয়া দিতেন। অভাগিনী রাণী দূরে দাঁড়াইয়া, ভক্ত যেমন দেবতা দর্শন করে, তেমনি করিয়াই মাতা-পুত্রের এই স্নেহের অভিব্যক্তি দেখিতে থাকিত। করাত দিয়া দেহ চিরিলে শরীরে

যেরূপ যাতনা অনুভূত হয় তাহার অন্তর মধ্যেও তেমনি অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিত ;—দিনান্তে একবার পুত্র-মুখ-চুম্বন করিবার জন্য সে ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিত। কোনদিন তাহার সে বাসনা পূর্ণ হইত, কোন দিন বা অতৃপ্ত বাসনার আগুন বুকে চাপিয়াই তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইত! কখন অজ্ঞাতে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সমস্তবুক খানা আলোড়িত করিয়া বাহির হইয়া যাইত ; সে শব্দে সে আপনিই চমকিয়া উঠিত ; মন চঞ্চল হইত,—"বাছার যদি অকল্যাণ হয়!"

ক্রমেই বালক অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিতে ছিল ; তাহার চাপল্য, তাহার কলহাস্যে জমিদারের সুবৃহৎ বাটীখানি সারাদিন মুখরিত হইয়া থাকিত। রাণীর নিকট সে আর বড় একটা ধরা দিতে চাহিত না। রাণীও কিন্তু নাছোড়বান্দা ; মানস ঘুমাইলে সে ধীরে ধীরে চোরের মত তাহার পার্শ্বে যাইয়া একটা স্নেহ-চুম্বন তাহার কপোলে অঙ্কিত না করিয়া থাকিতে পারিত না। যেদিন তাহার এ সুযোগ মিলিত না, সে দিনটাই তাহার নিকট ব্যর্থ মনে হইত।

বিধাতা কিন্তু এ সুখটাও অভাগিনীকে অধিক দিন ভোগ করিতে দিলেন না ; শীঘ্রই জমিদার বাটী হইতে তাহার অন্নজল উঠিল। একদিন গৃহিণী বলিলেন,—"দেখগা বাছা খোকার ঝি, বাবু ব'লছিলেন, মানস এখন শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে ডাগরটী হ'য়েছে, আর তোমায় রাখবার দরকার কি?"

রাণী স্থির হইয়া এই মৃত্যু-দণ্ডোপম আদেশ শুনিল। প্রাণ

তাহার যাতনা বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল ; সে অনুনয়ের স্বরে বলিল, —"মা, এতদিন আপনার বাড়ী রয়েছি, এখন আর কোথায় যাব ? আমার মাইনে চাই না, শুধু দুটি খেতে পেলেই হ'ল ।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কি ক'রব বাছা বাবুর মত নেই !"

"অমন কত লোক ত' তোমার বাড়ী খাচ্ছে মা !"

কিন্তু গৃহিণী কোন মতেই তাহাকে রাখিতে সম্মত হইলেন না।

বাক্যবাণ-বিদ্ধ রাণী ঠিক মরণাহত পাখীর মতই আপন কক্ষে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল ; কিন্তু হায়, দরিদ্র যে, তাহার সুখ-দুঃখে সংসারের কাহারই কিছু আসিয়া যায় না। অভাগিনী রাণীর আহত হৃদয়ের প্রতি কেহই চাহিয়া দেখিল না। তুষের আগুনের মত শোকের আগুন রাণীকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল।

পরদিন রাণী খাতাঞ্জিখানা হইতে দশবৎসরের মাহিনা ৩৬০৲ টাকা লইয়া আপনার কাপড় দুইখানি একটি পুটুলি বদ্ধ করিয়া পথে আসিয়া দাড়াইল।

এখন করা যায় কি ?

সে মনে মনে স্থির করিল চাকুরী আর করিবে না ; মাহিনার দরুণ টাকা খাটাইয়া সে কোনরূপে দিন গুজরাণ করিবে। সঙ্কল্পমত সে একখানা ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া লইল।

সমস্তদিন কোন কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। দেহটা এই কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও, প্রাণ তাহার সেই জমিদার বাড়িতে পড়িয়া থাকিত ;—মানসকে দেখিবার জন্য সে সমুৎ-

দিনটা দারুণ অস্বস্তির মধ্যে কাটাইয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। সন্ধ্যার সময় মানস ভৃত্যের সহিত গাড়ি করিয়া বেড়াইতে যায়, রাণীর তাহা জানা ছিল। যে পথ দিয়া সে সান্ধ্য-ভ্রমণে যাইত, রাণী অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সেই পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। নক্ষত্র বেগে তেজস্বী অশ্বদ্বয় মানসকে লইয়া ছুটিয়া যাইত, শুধু এইটুকু দেখিবার জন্যই তাহার এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সন্তানকে দিনান্তে একবার এই চকিতের দেখা দেখিয়াই অভাগিনী তৃপ্ত হইত।

তাহার পর একদিন রাণী শুনিল মানস বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে যায়; কথাটা শুনিয়া সে আর সন্ধ্যাবধি অপেক্ষা করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া সে স্কুলের প্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া দেড়টা বাজিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেড়টার ছুটি হইলে সকল ছেলের সহিত মানসও বাহিরে আসিল। অভাগিনী জননী প্রাচীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই হাস্য-চঞ্চল শিশুর ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে ছিল প্রাচীরের এই ক্ষীণ বাধা অতিক্রম করিয়া একবার বাছাকে একটা চুম্বনদান করিয়া তাহার অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের তৃষ্ণা দূর করে; কিন্তু কাজে-কর্ত্তব্যে তাহা পারিল না। এই ইট-সুরকি দিয়া গাঁথা ক্ষুদ্র প্রাচীরটা তাহার পুত্রের এত নিকটে থাকিতেও এতটা ব্যবধানের সৃজন করিয়াছে—এতটা দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে।

রাণী মধ্যে মধ্যে মানসকে ডাকিত। বালক কোন দিন আসিত, কোন দিন বা বিরক্তিভরে দূরে সরিয়া যাইত। রাণী

কিন্তু দিনের মধ্যে দুইবার পুত্রের দর্শন পাইবার সুযোগ পাইয়া অন্তরের মধ্যে যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এমনি করিয়াই তাহার দিনগুলা কাটিয়া চলিতেছিল। দ্বিপ্রহরে তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া সে স্কুলের প্রাচীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত এবং চারিটার পর মানস যখন গাড়িতে উঠিয়া বাটী চলিয়া যাইত, সে তখন ধীরে ধীরে আপনার কুটীরে ফিরিয়া যাইত। তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিত; সে ছুটিয়া গিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া মানসের গাড়ির প্রতীক্ষা করিত।

এমনি করিয়া দীর্ঘ দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল। প্রতীক্ষাই তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এটা না করিয়া সে থাকিতে পারিত না।

[৪]

একদিন রাণী দেখিল স্কুলের ছুটি হইলে মানস হাঁটিয়া যাইতেছে, সে দিন তাহার গাড়ি আসে নাই।

রাণী ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিল। মানসের নিকটস্থ হইয়া সে বলিল,—"তোমার আজ গাড়ি আসেনি কই বাবা?"—মানস কথা কহিল না।

রাণীর প্রাণটা বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। প্রাণের বেদনা প্রাণে চাপিয়া সে আবার বলিল,—"দাওনা বাবা! তোমার বই শ্লেট আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

বিরক্ত মুখে মানস বলিল,—"না না, তোমার আর অত ক'রতে হবে না।" তাহার পর সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া সেই রূপ উচ্চকণ্ঠেই বলিল,—"ভাল জ্বালাতেই পড়েছি কিন্তু, মাগী কোথাকার কে তার ঠিক নেই, অথচ রাতদিন ছায়ার মত পেছনে পেছনে ঘুরছে! একবার যদি একা থাকবার যো আছে!"

সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলিল,—"মাগীর কি ছিরি ছাঁদ, যেন মালিনী মাসী!"

বালকগণ হাসিয়া উঠিল। মানসও সে হাস্যে যোগ দিয়াছিল। তাহার কলহাস্য আজ তীক্ষ্ণ শরের মতই ব্যথিতা জননীর অন্তরে বিঁধিল।

আর একজন বলিল,—"মাগী হয় পাগল, আর না হয় ত' মানসের কোন অনিষ্ট করবার চেষ্টায় ফিরছে।"

মানস বলিল,—"শেষেরটাই সম্ভব!"

রাণী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের মধ্যে অশ্রু জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। পা দুইখানা যেন অসাড়, নিস্পন্দ হইয়া আসিতেছিল; কোন মতেই সে দুইখানা আর অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না।

বালকগণ চলিয়া গেল।

রাণী ব্যথা-ব্যাকুলিত প্রাণখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া স্খলিত পদে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিল। কোন মতে দ্বার বন্ধ করিয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল।

প্রাণ তাহার হাহাকার করিতেছিল। অন্তরে তাহার দাবাগ্নি

জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই দিনই তাহার প্রবলবেগে জ্বর আসিল।

কয়েকদিন জ্বর ভোগ করিয়া সে এক প্রতিবেশীকে অনুনয় বিনয় করিয়া একবার কেদার ডাক্তারকে ডাকিতে বলিল।

কেদারবাবুর প্রাণখানি দীন দুঃখীর প্রতি করুণায় পূর্ণ ছিল। চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তিনি এই হৃদয়-বৃত্তিটা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তিনি যখন রাণীর কুটীরে পদার্পণ করিলেন তখন বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল; রাণীর কুটীর মধ্যে একটা প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। কেদারবাবু রোগিনীর ধমনীর বেগ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহার জীবন দীপও নির্ব্বাণ উন্মুখ। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

অস্পষ্ট দীপালোকে চিকিৎসকের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া রাণীর মুখে কষ্টের ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীর কণ্ঠে বলিল,—"ডাক্তার বাবু, চিকিৎসা করাবার জন্যে আপনাকে ডাকিনি; বসুন, যে জন্যে ডেকেছি বলছি।"

একটা পিঁড়ে টানিয়া লইয়া ডাক্তার বসিলেন।

রাণী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আপনার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল। বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎ যাহা কিছু ঘটিয়াছিল সকল কথা বলিয়া উপসংহারে বলিল,—"এখন আমার প্রার্থনা, আমার মাইনের টাকাগুলি, যা এতদিন দেহের

রক্তের মত সঞ্চয় করে এসেছি, সে গুলি আপনি দয়া ক'রে আমার মানসের হাতে দেবেন। ব'লবেন তার ধাইমা'র জীবনের শেষ উপহার, বাছা যেন প্রত্যাখ্যান না করে। বলুন ডাক্তার বাবু, আপনি একাজ ক'রতে পারবেন?"

অশ্রু মুছিয়া কেদার বাবু বলিলেন,—"পারব মা!"

ধীরে ধীরে রাণীর মুখে একটা তৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল; দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—"শুধু একটা দুঃখ রইল, শেষ সময় বাছাকে একবার দেখতে পেলুম না।"

হায় মা!

সভা-কবি।

[১]

তরুণ যুবা তুকারাম প্রথম দিনেই সম্রাট সাজাহানের মন হরণ করিলেন। তাঁহার ললিত কণ্ঠের মধুর গীতি শুনিয়া সেদিন সভাশুদ্ধ সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল; অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইয়া বলিতে হইয়াছিল,—"এমন গান শোনবার সৌভাগ্য এই তাদের প্রথম!"

মুগ্ধ সম্রাট সস্নেহ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"যুবক, তোমার এ অমূল্য গানের দাম দি' মোগল রাজকোষে এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কি তোমায় দেব, তুমিই তা বলে দাও!"

আভূমি নত হইয়া কুর্ণিসের উপর কুর্ণিস করিয়া যুবক বলিলেন,—"ভারতেশ্বর, আপনার অনুগ্রহ ছাড়া বান্দার আর কিছুই আকাঙ্খার বস্তু নেই;—শুধু এই চাই, বান্দার উপর খোদাবন্দের যেন চিরদিন এইরকম স্নেহ থাকে!"

সম্রাট যুবকের প্রার্থনা শুনিয়া স্মিত হাস্য করিলেন। বলিলেন,—"তোমার প্রার্থনাই পূর্ণ হোক, আজ থেকে তোমায় আমি সভা-কবি নিযুক্ত করলুম; কিন্তু যুবক, আজ তুমি ইচ্ছে করলে রাজ্যেশ্বর হ'য়ে লক্ষ লোকের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা হ'তে পারতে!"

পুনঃ পুনঃ কুর্ণিস করিয়া যুবক বলিলেন,—"সাহন-সা'র প্রথম

দানই আমার অধিক প্রিয়, রাজা মহারাজ হবার দুরাকাঙ্খা আমার নেই। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয়!"

বাদসাহ বলিলেন,—"বেশ, তবে আজ থেকে তুমিই আমার সভা-কবি হ'লে।"

তাহারপর সভা-কবিকে আবশ্যক মত বাসভবন ও আহারের সংস্থান করিয়া দিবার আদেশ মন্ত্রীর উপর দিয়া সম্রাট সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করিলেন।

অন্তঃপুরিকাগণের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে একটা মৃদু বলয়-নিক্কণ-শব্দ তুকারামের কর্ণে প্রবেশ করিল। সভাশুদ্ধ লোকের প্রশংসায় লজ্জিত কবি মুখ তুলিয়া চাহিতেই মনে হইল কারুকার্য্য খচিত মহার্ঘ্য সূক্ষ্ম আবরণের পশ্চাতে দুইটী প্রশংসমান কৃষ্ণ চক্ষু যেন তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে। ত্বরিতে তিনি আপন দৃষ্টি নত করিলেন।

প্রধান অমাত্য তুকারামকে আপনার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। দলে দলে লোক তখন রাজসভা হইতে বাহির হইতেছিল। তুকারাম আপনার বীণ্‌টী সাবধানে ধরিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন; কোন দিন তিনি রাজসভায় আসেন নাই। আজ এই প্রথম পদার্পণ করিয়া, কাজেই তিনি একটু ভীত, একটু ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত লোক চলিয়া গেলে পথ যখন অনেকটা জন শূন্য হইল তুকারাম তখন ধীরে ধীরে সভার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; পথ তখন জন শূন্যপ্রায়; সেখানে তিনি প্রধান অমাত্যের কোন সন্ধানই

পাইলেন না। তুকারাম একটু বিপদে পড়িলেন; কোথা যাইবেন, কি করিবেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, বিহ্বল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন।

তিনি যখন এইভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিতে ব্যস্ত সেই সময় একজন সুন্দরী যুবতী আসিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইল। অধরে তাহার বিশ্ববিজয়ী হাস্য, সুন্দর হস্তদ্বয় মেহেদী রঞ্জিত, পদে মেহেদীর অলক্ত, পরিধানে একখানি আসমানি রঙের বস্ত্র ও আঙ্‌রাখা। তুকারাম রমণীকে এভাবে প্রকাশ্য রাজপথের মধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া যেমনি বিস্মিত হইলেন তেমনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। লোকে দেখিলে বলিবে কি? মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইলেও তিনি কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুন্দরী হাসির কাজলে আপনার সুন্দর মুখখানি অধিকতর সুন্দর করিয়া বীণানিন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"আপনিই কি আজ সভা-কবি হ'য়েছেন?"

তুকারাম অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, কেন?"

"একখানা চিঠি আছে আপনার নামে।"—বলিতে বলিতে সুন্দরী কাঁচলীর অভ্যন্তর হইতে একখানি সুবাসিত মহার্ঘ্য আবরণে আবৃত পত্র বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল,—"গোপনে পড়ে দেখবেন, কেউ যেন না দেখতে পায়!"

সুন্দরী চক্ষের নিমেষে কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া গেল,

তুকারাম তাহা বুঝিতেই পারিলেন না। তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, পত্র কে লিখিল ?

[২]

সুন্দর সজ্জিত একটী বাগান বাটীতে তুকারামের বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। বাটীখানির চতুর্দ্দিকে শ্বেত, পীত, লোহিত নানা বর্ণের অসংখ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প সে স্থানটীকে নন্দন কাননের মতই অনিন্দ্য করিয়া তুলিয়াছিল। শরতের নির্ম্মল আকাশ; অসংখ্য তারকা দলে পরিবৃত হইয়া নীলাকাশে শুভ্র চন্দ্র হাসিতেছিলেন। তুকারাম বীণ্ বাদন করিতে করিতে গুন্‌গুন্ রবে গান করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার দ্বিপ্রহরের সেই গুলাবগন্ধ সুবাসিত পত্রখানির কথা মনে পড়িয়া গেল। বীণ্‌টা পার্শ্বে সানবাঁধান মেঝের উপর রাখিয়া তাড়াতাড়ি তিনি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই সুবাসিত আবরণে আবৃত পত্রখানা লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আবরণ উন্মোচন করিয়া পত্রখানা তিনি পাঠ করিলেন,—

"প্রিয়তম,—তোমায় একবার দেখিয়াই, একটা গান শুনিয়াই আমি তোমার চরণে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছি। দাসী বলিয়া আমায় গ্রহণ করিবে না কি ? তোমার আশা পথ চাহিয়া রহিলাম।

—একান্ত তোমারই।"

পত্রখানা পাঠ করিয়া তুকার বিস্ময়ের সীমা রহিল না,—কে এ পত্রের লেখিকা তাহা তিনি কোন মতেই ভাবিয়া পাইলেন না। ভাবিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া তিনি সে প্রসঙ্গ মন হইতে ত্যাগ করিলেন।

শরতের শুভ্র চন্দ্রালোকে তাঁহার মনের মধ্যে মানসীর কল্পনাময়ী ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল ; মুগ্ধ কবি সেই কল্পনার মানসী মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া তখন নূতন গীত রচনায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। পত্র খানার কথা অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ভুলিয়া গেলেন!

পরদিন রাজসভায় আসিয়া প্রথমেই তিনি রাজ-বন্দনা আরম্ভ করিলেন। ললিত কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সঙ্গীত থামিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া কবির গলায় জয়-মাল্য পরাইয়া দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভাগৃহ জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

মুগ্ধ কবি চোখ তুলিয়া দেখিলেন আজও ঠিক সেই স্থানটীতে, সেই মহার্ঘ্য সূক্ষ্ম বস্ত্রের পশ্চাতে সুন্দর প্রশংসমান চক্ষুদুইটী তাঁহারই দিকে হাস্যোজ্জ্বল-দৃষ্টি বর্ষণ করিতেছে। সম্রাটের স্বহস্ত প্রদত্ত বিজয়-মাল্য পরিধান করিয়া তাঁহার যত না আনন্দ হইয়াছিল, এই অপরিচিত সুন্দরীর হাস্যরঞ্জিত চক্ষের অভিনন্দন-দৃষ্টিতে তাঁহার তদপেক্ষা দ্বিগুণ আনন্দ ও গর্ব্বে বুক ভরিয়া উঠিল।

চেষ্টা করিয়াও তুকারাম আপনার দৃষ্টি সংযত করিতে পারিলেন না, মধ্যে মধ্যে সেই অন্তরালবর্ত্তিনীর দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছিল। সম্রাট প্রতিদিনই তুকারামের প্রতি অধিকতর প্রীত হইতেছিলেন। সভার সকলেই কবিকে প্রীত চক্ষে দেখিতেছিলেন ; এমন হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীতের জন্ম কে না গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে ?

পত্রখানি পাইবার পর চারিদিন কাটিয়া গিয়াছে ; সেদিন সন্ধ্যার সময় কবি আপন বাসভবনের উদ্যান মধ্যে বসিয়া প্রতিদিনের মতই নূতন গীত রচনায় নিযুক্ত ছিলেন এরূপ সময়ে পূর্ব্বদৃষ্ট রমণী আসিয়া কুর্ণিস করিয়া দাঁড়াইল।

বিস্মিত কবি প্রশ্ন করিলেন,—"কি চাই ?"

সেদিনের মত সুন্দর মুখে হাসির কাজল টানিয়া জ্যোৎস্নাস্নাতা সুন্দরী আপন কাঁচলীর মধ্য হইতে আর একখানি সুগন্ধি, মহার্ঘ্য আবরণে আবৃত পত্র বাহির করিয়া কবিকে দিয়া বলিল,—"পড়ুন।"

সুন্দরীর অনুরোধ মত তিনি সেখানি পড়িতে লাগিলেন,—"নিষ্ঠুর,—তোমার জন্য এই কয়দিন আমি বিষম অন্তর্যাতনা অনুভব করিতেছি, আর তুমি একছত্র পত্র লিখিয়াও আমায় তৃপ্ত করিতে পারিলে না ? বোধ হয় তুমি আমায় চিনিতে পার নাই ;—কিন্তু তাহাই বা বলি কি করিয়া ? যদি আমায় চিনিতেই না পারিয়া থাক, আমার প্রতি তোমার যদি কিছুমাত্রও ভালবাসা

না থাকে, তবে রাজ সভায় বসিয়া অত ঘন ঘন আমার দিকে চাহ কেন? আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইলে তোমার আনন্দ-চঞ্চল চক্ষুদ্বয় স্বতঃই ভূ-সংলগ্ন হইয়া পড়ে কেন? আমার অনুমান কি সত্য নহে?—ওগো নিষ্ঠুর, ওগো হৃদয় হীন, আর আমি কোন মতেই তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না;—একবার এস প্রিয়তম! এই পত্র বাহিকা সোফি তোমায় লইয়া আসিবে; তোমার নিকট বিনীত অনুরোধ তুমি আমার এ ঐকান্তিক বাসনা অগ্রাহ্য করিও না।—একান্ত তোমারই।"

মাথার উপর চাঁদনীর আলো, সম্মুখে সুন্দরী যুবতী, আর কোন অর্দ্ধ পরিচিতা রূপসীর প্রেমপত্র হস্তে লইয়া কবি যেন উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া দিল,— "সোফির সঙ্গে গেলে মানসীর সন্ধান মিলবে।"—কথাটা অন্তর মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিবা মাত্র তিনি উঠিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সোফি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই কবি প্রসাধন শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া সোফিকে বলিলেন,—"চল!"

সোফি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—"সাহেব, এবেশে যাওয়া হবে না, এস তোমায় আমি সাজিয়ে দি!"—বলিয়া সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে নানাবিধ ছদ্ম বেশ ধারণোপযোগী দ্রব্যাদি বাহির করিয়া কবিকে সাজাইতে বসিল।

তাঁহার নবীন গুম্ফ সুশোভিত কমনীয় মুখখানির উপর

সোফি একটী রমণীর মুখস পরাইয়া দিল, তাহার পর রমণী সুলভ দীর্ঘ কেশ রাজিতে মস্তক আবৃত করিয়া দিল। একটী আসমান্ রঙের আঙ্‌রাখায় কবির দেহাবৃত করিয়া সুন্দর বস্ত্রে তাঁহাকে যুবতী রমণীতে পর্যাবসিত করিল। আয়নার সম্মুখে গিয়া কবি দেখিলেন কোন কুহকীর কুহক-দণ্ড স্পর্শে তিনি এমনি স্বাভাবিক রমণী মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছেন যে, আপনিই আপনাকে ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। কোন কথা না বলিয়া তিনি সোফির অনুসরণ করিলেন। কল্পনার মানসী মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, কোথায় যে সোফি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার অবধি তিনি আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না।

[৩]

ধীরে ধীরে সোফি তাঁহাকে লইয়া রাজ প্রাসাদের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইল। সশস্ত্র প্রহরী দুই পদ অগ্রসর হইতেই সোফি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কি একটা বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহারী সসম্মান অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। সোফি কবিকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিল।

মহালের পর মহাল পার হইয়া কবি সোফির অনুসরণ করিতে-ছিলেন। স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন করিয়া কোনদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া চলিয়া যায়, কবিও ঠিক তেমনি অন্ধ ভাবেই

সোফির অনুসরণ করিতেছিলেন। কোথায় যাইতেছেন তাহা তিনি অনুমান অবধি করিতে পারিলেন না।

অবশেষে রঙ্গমহালের দ্বারদেশে আসিয়া সোফি দাঁড়াইল। ভীষণ মূর্ত্তি তাতার প্রহরিণী মুক্ত তরবারি হস্তে দ্বারে প্রহরণা করিতেছিল। সোফির সহিত একজন নবীনাকে দেখিয়া সে বলিল,—"এ কে ?"

সোফি ত্বরিতে উত্তর দিল,—"আমার বোহিন্ !"

"কোথায় যাবে ?"

"বাদসাজাদীর মহলে।"

"বাদসাজাদীর পঞ্জা আছে ?"

বিনা বাক্যব্যয়ে সোফি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পঞ্জাখানি বাহির করিয়া দেখাইল। প্রহরিণী আলোকের নিকট গিয়া সেখানি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সোফিকে ফিরাইয়া দিল ; সঙ্গে সঙ্গে সে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল।

সোফি কবিকে লইয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিল। সাবধানে দ্বাররুদ্ধ করিয়া সে কবিকে একখানা সোফার উপর বসাইয়া তাঁহার ছদ্মবেশ অপসৃত করিতে লাগিল। গৃহমধ্যে সুবর্ণ আধারে সুগন্ধি তৈলের একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সমস্ত ঘরটা বহুবিধ বিলাস দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ। দরিদ্র কবি বিহ্বল দৃষ্টিতে সেইগুলা দেখিতেছিলেন ; কতক্ষণ পরে ছদ্মবেশ অপসৃত করিয়া সোফি বলিল,—"আমার সঙ্গে আসুন সাহেব।"

সে অপর একটা দ্বার খুলিয়া কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম

করিয়া কবিকে এবার যে কক্ষে আনয়ন করিল, শরতের চন্দ্রালোকের মতই স্নিগ্ধ আলোকে সে কক্ষ পূর্ণ। প্রাচীর গাত্রে বহুমূল্য তস্‌বীর এবং সমস্ত কক্ষটার বায়ু শতদল অপেক্ষাও মিষ্ট গন্ধে পরিপূর্ণ। বিহ্বল কবি বুঝিতে পারিলেন না, এ তিনি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে যে এমন সুন্দর সৌন্দর্য্যময় স্থান থাকিতে পারে স্বচক্ষে দেখিয়াও তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না।

স্নিগ্ধ আলোকপূর্ণ কক্ষটার এক পার্শ্বে বহু কারুকার্য্য খচিত একখানি স্বর্ণ পালঙ্কের উপর মূল্যবান কোমল কিংখাপ শয্যা আস্তৃত। কক্ষের মেঝে মূল্যবান সুদৃশ্য গালিচায় আবৃত।

সোফি কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া আভূমি নত হইয়া কুর্ণিস করিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। পালঙ্ক হইতে কে একজন কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"কি হ'ল সোফি?"

"এসেছেন এই যে!"—সোফির বাক্য শেব হইতে না হইতে শয্যার উপর একজন অসীম সুন্দরী রমণী উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সেই কমনীয় মুখ খানির উপর স্নিগ্ধ আলোকপাতে স্বর্গের পরীর মতই তাঁহাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বোধ হইতেছিল।

বিস্মিত কুতূহলী কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যেন খোদাতালার অসীম অনুগ্রহে আজ তাঁহার চক্ষের সমক্ষে তাঁহার কল্পনার মানসী মূর্ত্তি বাস্তবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নাসিকায় পুষ্পসারের সৌরভ, নয়ন সমক্ষে এই হৃদয়োত্তেজক রূপাগ্নি এবং সুন্দরী শিরোমণির

কোমল করের কমনীয় স্পর্শ, এই ত্র্যহস্পর্শে কবিকে যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। বিহ্বল কবি একটা কথাও না বলিয়া সুন্দরী নির্দ্দিষ্ট মখমলের সুকোমল আসনে উপবেশন করিলেন।

রমণী সোফির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাঁদী, সিরাজী!" সোফি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। রমণী তখন কবির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমার গান আমার বড় ভাল লাগে, একটা গাওনা!"

কবির এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবার মত শক্তি ছিল না। তেমনি অৰ্দ্ধ বিলুপ্ত চেতনাবস্থায় কক্ষপ্রাচীর হইতে একটা বীণ্ পাড়িয়া লইয়া তিনি গাহিলেন,—

তোমারি আশাপথ চাহি, কত যুগ গিয়াছে বহি,
যদি আজি আসিলে, প্রেয়সী মম, সাধনা, সিদ্ধি, মানসী!—
তাপিত তৃষিত হিয়া, স্নিগধ কর প্রিয়া
মম হৃদয় সরসে অবগাহি!
খেলিছে বিজলী রূপের হিল্লোলে, চঞ্চল পরাণি কটাক্ষ বিলোলে
নিমীলিতে আঁখি মোর শকতি নাহি, গো প্রেয়সী!
যদি আজি আসিলে, প্রেয়সী মম, সাধনা, সিদ্ধি, মানসী!—

বহুক্ষণ অবধি কবির নিপুণ হস্ত বীণার তারে তারে ঝঙ্কার করিয়া ফিরিল, বহুক্ষণ ধরিয়া স্নিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল নির্জ্জন কক্ষে

যুবক যুবতী মুগ্ধ নয়নে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গান থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহার সুমধুর রেশ, সুমিষ্ট মূর্চ্ছনা ঘুরিয়া ফিরিয়া, উঠিয়া নামিয়া কক্ষটীকে মধুর সুরে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। যুবক-যুবতী হেনার মিষ্টগন্ধ, সুবাসিত তৈলের স্নিগ্ধ আলোক ও অগুরু-চন্দনের প্রাণ মাতান সৌরভে মুগ্ধ বিহ্বল হইয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিলেন! একটা মধুর আবেশ, একটা পুলকাবেগে মুহুর্মুহুঃ তাঁহাদের তনু শিহরিয়া উঠিতেছিল;—প্রাণে বসন্তের মলয়ানিল খেলিতেছিল। একটা আবেগ, একটা বিহ্বলতার সহিত উভয়ে উভয়ের রূপ-সুধা পানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কতক্ষণ পরে দুইটা হীরক খচিত সুবর্ণ পাত্র স্নিগ্ধ সিরাজী পূর্ণ করিয়া আনিয়া সোফি ডাকিল,—"বাদসা জাদী!"

রমণীর চমক ভাঙ্গিল। সোফির হস্ত হইতে একটা পাত্র লইয়া তিনি কবির দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন; মুগ্ধ কবি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার চির সাধনার মানসী মূর্ত্তির হস্ত হইতে পাত্রটা লইয়া এক নিঃশ্বাসে সেটা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন; বাদসা-জাদীও অপর পাত্রটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। সোফি আবার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল। পাত্রের পর পাত্র উদরসাৎ করিয়া উভয়ে নিরস্ত হইলেন। সোফি পাত্র দুইটা লইয়া চলিয়া গেল। বাদসাজাদী এবার কবির পরিত্যক্ত বীণ্‌টা তুলিয়া লইয়া কোকিল নিন্দিত কণ্ঠে গান ধরিলেন।

মুগ্ধ কবি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কি অসীম সুন্দর আজিকার এই ঘটনাটা ! কবির মনে হইতেছিল আজিকার ঘটনাটা যেন আগাগোড়াই একটা মধুর স্বপ্ন,—শুধু একটা অনুভূতি, সত্য ইহার মধ্যে এতটুকুও নাই !

রমণী গাহিতেছিলেন,—

জীবনেরই সাধনা
বিফল যাবে না
পূরিবে পূরিবে মন আশ,
মুগধ দু'নয়ান
চরণে সঁপেছি প্রাণ
ফিরিবার নাহি অবকাশ ;—
প্রিয়গো, বঁধু গো,
জীবনের মধু গো,
পরশে ফুটাও প্রাণে বাস—

অকস্মাৎ বাদসাজাদী বীণ্‌টা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কবিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া আবেশ বিহ্বল স্বরে ডাকিলেন,—"প্রিয়, প্রিয়তম আমার !"

সর্পাহত ব্যক্তি যেমন করিয়া চমকিয়া উঠে বাদসাজাদীর ওষ্ঠ স্পর্শে কবি তেমনি করিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। বসোরাই গোলাপের মত বাদসাজাদীর লোহিত কোমল অধর স্পর্শে এক নিমেষে তাঁহার সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেল। ত্বরিতে তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যথা-কাতর-কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"বাদসা-

জাদী, আমার স্বপ্ন টুটে গেছে! তোমায় আমার কল্পনার মূর্ত্তিমতী মানসী মনে করেছিলুম, সে ভুল এখন আমার ভেঙে গেছে;—আমার মানসী এমন ইন্দ্রিয় পরায়ণা নয়,—সে দেবী। সে আমার চোখের সামনে অসীম রূপের জ্যোতিঃ ছড়িয়ে দাঁড়াবে আর আমি তাকে প্রেমের অর্ঘ্য দেব, পূজো ক'রব, ব্যস্!"

বাদসাজাদী কবির দুই পদ কোমল বাহুর বেষ্টনে বদ্ধ করিয়া করুণ স্বরে বলিলেন,—"ওগো নিষ্ঠুর, ওগো হৃদয় হীন, অমন ক'রে আমার হৃদয় দু'পায়ে দলন করে যেয়ো না! কৃপা কর, ওগো কৃপা কর, আমি তোমার মানসী হবার স্পর্দ্ধা রাখি না, শুধু দাসী বলে গ্রহণ কর, তা হলেই আমি যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে ক'রব।"

দৃঢ় কণ্ঠে কবি বলিলেন,—"তা হয় না বাদসাজাদী, তা হবার নয়, এত কৃতঘ্ন আমায় মনে ক'র না। এই রঙ্গমহালের ভেতর আসাই আমার অন্যায় হ'য়েছে, তার ওপর আবার অতবড় অপরাধ আমি জেনে শুনে ক'রতে পারব না।"

বাদসাজাদীর সুপ্ত আভিজাত্য মাথা তুলিয়া উঠিল, রুক্ষকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"কার সঙ্গে কথা কইছ জান কি কবি? আমি ভারত সম্রাট সাজাহানের মেয়ে রোসেনারা........."

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কবি জানুপাতিয়া বাদসাজাদীকে কুর্ণিস করিয়া বলিলেন,—"সা'জাদী, ভারত সাম্রাজ্ঞী আজ যদি আমায় এ আদেশ করতেন তাহ'লেও আমি তা ঠিক এমনি ভাবেই প্রত্যাখ্যান করতুম জানবেন। আমার মত অপরিবর্ত্তনীয়!"

কবির স্পর্দ্ধা দেখিয়া সা'জাদী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার সমস্ত মুখখানা গাঢ় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল,—"মূর্খ, একদিকে প্রেম,—অসীম ভালবাসা, অনন্ত উপভোগ, অন্য দিকে বিশ্বাসঘাতকের যন্ত্রণাময় মৃত্যু, বেছে নাও যেটা তোমার ইচ্ছে!"

"মৃত্যু, সা'জাদী!"—কবির সংকল্প দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল।

"তাই হোক তবে।" সাহজাদী সদর্পে ভূমে পদাঘাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন ভীম দর্শন তাতার প্রহরিণী মুক্ত অসি হস্তে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্রোধ বিকম্পিতকণ্ঠে সাহজাদী আদেশ দিলেন,—"এই ছদ্মবেশী নেমক্‌হারামকে হাজতে নিয়ে যা!"

সঙ্গে সঙ্গে তাতার প্রহরিণী সাহজাদীর আদেশ পালন করিল।

[৪]

বাদসাহের খাস কামরায় দরবার বসিয়াছিল। মাত্র কয়েক-জন অমাত্য ও স্বয়ং ভারত সম্রাট সে দরবারে উপস্থিত ছিলেন। দ্বারে আটজন করিয়া সশস্ত্র প্রহরী প্রহরণায় নিযুক্ত।

গম্ভীর স্বরে বাদসাহ বলিলেন,—"বন্দীকে নিয়ে এস!"

দুইজন প্রহরী বেষ্টিত হইয়া শৃঙ্খলিত কবি রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। সদাহাস্যময় মুখখানি তাঁহার ম্লান, বিষণ্ণ; চোখের কোলে একটা গাঢ় কালিমা-রেখা অঙ্কিত, দৃষ্টি তাঁহার ভূ-সংলগ্ন!

রোষ কষায়িত নেত্রে সম্রাট তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—
"বিশ্বাসঘাতক কুক্কুর, স্নেহের যথেষ্ঠ প্রতিদান দিয়াছিস্!"

অবনত মস্তকে ধীরকণ্ঠে কবি বলিলেন,—"ভারত সম্রাট্, তুকারাম আর যাই হোক, সে বিশ্বাসঘাতক নয়,—কৃতঘ্ন নয়।"

সপদদাপে সম্রাট বলিলেন,—"চুপ্ কর বাঁদির বাচ্ছা, শোন্ তোর বিরুদ্ধে স্বয়ং সা'জাদি কি অভিযোগ ক'রছেন, তারপর তোর যা বলবার থাকে বলিস্।"

বাদসাহ কি একটা ইঙ্গিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পশ্চাতের কিংখাপের পরদা অপসৃত করিয়া বিদ্যুৎবরণী রোসে-নারা সূক্ষ্ম বস্ত্রের অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া পিতৃসমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অমাত্যগণ সসম্মানে আসন ত্যাগ করিয়া বাদসাজাদীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

বাদসাহ কন্যারদিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বন্দীর বিরুদ্ধে তোমার যা অভিযোগ আছে বলে যাও।"

কুর্ণিস করিয়া সাহজাদী বলিতে লাগিলেন,—"বন্দী কাল রাত্রে রমণীর ছদ্মবেশে আমার ঘরে আসে, সোফি তখন আমার কাছে ছিল। ফুলওয়ালী বলে ও আত্ম-পরিচয় দেয়। গোটাকতক গোড়ে আমি ওর কাছথেকে কিনেছিলুম। সোফিকে দাম দিতে বলায় সে দাম আনতে নিজের ঘরে চলে যায়। সেই অবসরে নির্জ্জনে আমায় একা পেয়ে দুর্বৃত্ত আমায় সবলে আলিঙ্গন করে পুনঃপুনঃ চুম্বন করে, তারপর........."

বাধাদিয়া বাদসাহ বলিলেন,—"থাক্, আর বলতে হবে না।" তাহার পর বন্দীরদিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমার কিছু বলবার আছে?"

কবি তখন বিস্ময় ও ঘৃণা মিশ্রিত দৃষ্টিতে বাদসাজাদীর দিকে চাহিয়াছিলেন; কি সুন্দর মিথ্যা রচনা......একবারও মুখে বাধিল না ত'! বাদসাহের কথায় তাঁহার চেতনা ফিরিল। নত দৃষ্টিতে কবি বলিলেন,—"দুনিয়ার মালেক, আমার যা বলবার ছিল আগেই বলেছি;—তুকারাম কৃতঘ্ন নয়, বাদসাজাদীর গল্প আগাগোড়া মিথ্যা!"

আরক্ত মুখে বাদসাহ বলিলেন,—"কিছু প্রমাণ আছে?"

তেমনি ভাবেই কবি বলিলেন,—"না, কোন প্রমাণ নেই।"

"বন্দী, কোন প্রমাণ তোমার না থাকা সত্ত্বেও তুমি মুখের ওপর সা'জাদীকে মিথ্যাবাদিনী ব'ল্‌ছ, এ গোস্তাকি তোমার ক্ষমারও অযোগ্য!" তাহার পর জল্লাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —"আসফ খাঁ, এ নেমক্‌হারামকে নিয়ে যাও, আমি এখুনি এর ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চাই!"

তৎক্ষণাৎ বাদসাহের আদেশ প্রতিপালিত হইল।

সাহজাদীর সমস্ত মুখখানা তখন একটা পৈশাচিক আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বাস্তু-ভিটা।

[১]

জমিদারের পাইক আসিয়া বলিল,—"খাঁ সাহেব! বাবু তোমায় তলব করেছেন, একবার এখুনি যেতে হবে।"

জমিদারের ডাক বাখর খাঁ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; পাইকের সহিত মধুগ্রামের জমিদার শশীবাবুর কাছারীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে সে প্রশ্ন করিল,—"কেন গোলামের ডাক পড়েছে জান সরদার?"

"বলতে লারনু!"—বলিয়া সর্দ্দার রঘুনাথ একটা বিঁড়ি ধরাইয়া দেশলাইটা টেঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল,—"খাজনা-ফাজনা বাকি আছে বুঝি?"

বাখর বলিল,—"কই?—না ত' সরদার! খাজনা ত আমি হাল সনের চোৎ-কিস্তি অবধি মিটিয়ে রেখেছি।"

"কে জানে বাপু, বড় লোকের কখন যে কি মরজি হয়, তা ত' বুঝতে পারি না।"—বলিয়া সে নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল।

অগত্যা বাখর খাঁও নীরবে চলিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা শশীবাবুর কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরকার শ্রীকণ্ঠ বলিল,—"এই যে বাখর এসেছিস্? চ' তোকে বাবুর কাছে নিয়ে যাই।"

বাথরের মনে একটু ভয় হইল। আজ জমিদার স্বয়ং তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন সুতরাং ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তুচ্ছ নহে। বাথর মনে মনে পীরের দরগায় মুরগী দিবে বলিয়া মানত করিল; মনে মনে পীরের নিকট আপনার মঙ্গল-কামনা করিয়া, সরকার ম'শায়ের পিছু পিছু কম্পিত পদে জমিদারের সদর মহলে প্রবেশ করিল।

সরকার একস্থানে জুতাটা খুলিয়া রাখিয়া নগ্নপদে যুক্ত করে অগ্রসর হইল।

ঘরজোড়া ফরাসের উপর বড় বড় তাকিয়া ফেলা ছিল; তাহারই একটাতে হেলান দিয়া জমিদার বাবু গড়গড়ার নল টানিতেছিলেন। সম্মুখে এবং পার্শ্বে কতকগুলি লোক জোড় হস্তে দাঁড়াইয়াছিল ও একজন আমলা অনেকগুলা বালির কাগজ নাড়িয়া চাড়িয়া জমিদার বাবুকে কি একটা বুঝাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল। শ্রীকণ্ঠ নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল; অগত্যা বাথরকেও অপেক্ষা করিতে হইল।

পূর্ব্বোক্ত আমলা অনেকগুলি নজির দেখাইয়া বলিল,—"হুজুর! হারাধন পাত্র এই তিন ছটাক জমি আজ দশ বচ্ছর ফাঁকি দিয়ে ভোগ করে আসছে, কেউ তা ধরতে পারে নি।"

জমিদার মুখ হইতে নলটা নামাইয়া বলিলেন,—"হারাধনকে সদরে তলপ কর। আর মোহিত বেটাকে সদরে ডেকে পাঠিয়ে এর কৈফেৎ তলপ কর,—কেন সে দেখে না, বসে ঘুমুবার জন্যে আমি তাকে মাইনে গুনি না। হারামজাদাকে ব'লবে, তার

একমাসের মাইনে আমি জরিমানা করলুম।”—তাঁহার দৃষ্টি হঠাৎ শ্রীকণ্ঠের উপর পড়িতেই তিনি বলিলেন,—“কিরে শ্রীকণ্ঠ, বাখর এল?”

শ্রীকণ্ঠ যুক্তকর মর্দ্দন করিতে করিতে বলিল,—“আজ্ঞে, এসেছে হুজুর!

“কৈ সে?”

বাখর একটু অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

জমিদার বাবু বলিলেন,—“ওরে বাখর! তুইত’ খালের পশ্চিম ধারের জায়গাটায় থাকিস?”

“আজ্ঞে কর্ত্তা!”

“তা এ হ’য়েছে, তোকে ওখান থেকে উঠতে হবে।”

“বল কি গো কর্ত্তা?”

“হ্যাঁ, ও জায়গাটায় আমার দরকার পড়েছে।”

“কিন্তু কর্ত্তা, আমরা যে তিন পুরুষ ধরে ওখানে রয়েছি!”

“তাতে কি? তোর ঘরের দাম পাবি।”

“না কর্ত্তা তা হতি হবে না।”

শ্রীকণ্ঠ বলিল,—“হতি হবে না কিরে ব্যাটা? হুজুরের নিজের দরকার!”

“তা ত’ বুঝলুম কর্ত্তা, কিন্তু সেই বাপ পিত’ম থেকে যেখানে ভূমিষ্ট হ’য়েছে সে জায়গা কি চট্‌ করে ছাড়া যায়?”

জমিদার বাবু এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,—“পাজী ব্যাটার আস্পর্দ্ধা দেখেছ, আমার জমি আমার দরকারে পাব না?”

বাথর কথা কহিল না।

শ্রীকণ্ঠ নিম্নস্বরে বাথরকে বলিল,—"মিথ্যে কর্ত্তার রাগ বাড়াস্ নি বাথর, চুপচাপ যা নেয্য দাম হয় নিয়ে চলে যা। কর্ত্তার যখন ঐ জমিটার ওপর ঝোঁক পড়েছে তখন উনি ওটা নেবেনই ; তবে রাগালে এই হবে যে জমিটাত যাবেই উপরন্তু এক পয়সাও পাবি না।"

বাথর জাতিতে পাঠান। মারপিটের ভয় সে কোন দিন রাখিত না।—আজিও রাখিল না। মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না কর্ত্তা তা আমি পারবনি। জমির তোমার দরকার হ'য়ে থাকেত' নালিশ করে আমায় উঠিও।"

জমিদারবাবু দরিদ্র প্রজার এতটা সাহস কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না ; বলিলেন,—"হারামজাদার যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা, পাজি বেটাকে থামে বেঁধে ঘা কতক জুতিয়ে দেও'!"

বাথর বলিল,—"কর্ত্তা, তোমার বাড়ি এসেছি এখন সব করতে পার কিন্তু আমিও পাঠান বাচ্ছা; মায়ের দুধ অনর্থক খাইনি, এর শোধ আমি নিতে পারব। যে ঠাঁইয়ে জন্মেছি, সে ঠাঁই রাখবার জন্যে জান কবুল করলুম, দেখি তুমি কেমন করে খেদাও!"

রক্তচক্ষে জমিদার বাবু হাঁকিলেন,—"কৈ হ্যায়?"

মুহূর্ত্তে দুইজন বলিষ্ঠ দ্বারবান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে জমিদার বাবু বলিলেন,— "হারামজাদাকে থামে বেঁধে বিশ জুতো লাগাও।"

দ্বারবানদ্বয় বাথরকে ধরিয়া লইয়া গেল।

শ্রীকণ্ঠ তখনও দাঁড়াইয়াছিল। জমিদারবাবু বলিলেন,—"যেমন করে হয় ব্যাটাকে দু'দিনের মধ্যে ভিটে ছাড়া কর।"

"য্যাজ্ঞে, হুজুর মা-বাপ, হুজুর যখন বলছেন তখন আমি একাজ জান দিয়েও ক'রব।"

"হ্যাঁ, মনে থাকে যেন, দুদিনের মধ্যে একাজ হাসিল হওয়া চাই-ই।"

"য্যাজ্ঞে!"—বলিয়া শ্রীকণ্ঠ বিদায় হইল।

জমিদার বাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই মূর্খ বাথরের এত সাহস হয় কিসে? হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তাঁহাকে যদি কেহ তাঁহার ভিটা ছাড়িয়া যাইতে বলে তবে সেটা কেমন হয়? মনে হইতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বিলাস অন্ধ নয়ন মুহূর্তের জন্য দেখিতে পাইল এই ক্ষুদ্র জমিটুকুর উপর কত গাঢ় তাঁহার মমতা! চকিতের মধ্যে তাঁহার মন কোমল হইল; কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁহার প্রিয়তমা রোসেনা বিবির কথা মনে পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল,—"আমাতে আর এই মূর্খ চাষাতে সমান? আমার বাগান বাড়ির জন্য যে জমির দরকার, তার ওপর যদি ভগবানেরও লোভ থাকে তবু তা আমায় নিতে হবে। আর ছোট লোকের আবার মায়া মমতা কি? তাদের যখন নিজের বলতে কিছু নেই, তখন এ অনর্থক মায়া করেই বা ফল কি?"

হায় দরিদ্র!

[২]

বাখরের পত্নী দিলজান উঠান ঝাঁট দিয়া সবে মাত্র মুরগীর ঘরটা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এরূপ সময়ে টলিতে টলিতে বাখর ফিরিয়া আসিল।

দিলজান সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। স্বামীর পদশব্দ পাইয়াই বলিয়া উঠিল,—"কিরে মুনিব ডেকে—"তাহার কথা অর্দ্ধ সমাপ্তই রহিয়া গেল স্বামীর অঙ্গে ক্ষত চিহ্ন ও তাহা হইতে প্রবাহিত রক্তধারা দেখিয়া তাহার গলা শুখাইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি ঝাঁটা ফেলিয়া, সে স্বামীকে ধরিয়া দাওয়ায় বসাইল, তাহার পর একখানা চেটাই আনিয়া বিছাইয়া দিয়া তাহাকে শুইতে দিল। বাখর অত্যধিক রক্তস্রাবে ক্লান্ত হইয়াছিল, দ্বিরুক্তি না করিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার ক্ষতগুলা জল দিয়া ধৌত করিতে করিতে দিলজান বলিল,—"তোর হ'ল কি ?"

কপালে হাত ঠেকাইয়া বাখর বলিল,—"নসীব।"

দিলজান বুঝিল বাখরের কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে ; সুতরাং সে আপনার দারুণ কৌতূহল আর কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার অবকাশ না দিয়া নীরবে তাহার ক্ষতগুলা বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাখর একটু সুস্থ হইয়া বলিল,—"শয়তান বলে কি জানিস্ ? তার বাগান বাড়ীর জন্যে আমায় ভিটে ছেড়ে যেতে হবে !"

"তা তোকে মারলে কে ?"

"সেই শয়তানের হুকুমে রামসিং আর তেওয়ারী বেটা আমায় জুতো খুলে মারলে।"

"তুই কিছু বল্লি না ?"

"কি ব'লব ? আমি একা, তারা সেখানে পঞ্চাশটা ! শুধু খোদাকে বল্লুম—"দেখে যাও খোদা গরীবের ওপর অত্যাচারটা ! এর কি কোন বিচার নেই ? জানিনা খোদার পায়ে কথাটা পৌছেচে কিনা !"

দিলজান কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল,—"কাজ কি বাপু এখানে থেকে ? আমরা ত' মোটে দুটো প্রাণী, যেথায় হ'ক থাকব !"

"দিলজান, তুই বলিস কি ? এর প্রতি মাটি টুকতে যে আমার বাপ পিত'মোর জীবনের কথা মাখান রয়েছে ! আর আমি তাদের ছাওয়াল হয়ে এক কথায় এ বেহেস্ত ছেড়ে যাব ? কেন আমি কি জোয়ান নই, মায়ের দুধ কি খাইনি ? বাপ পিত'মোর রক্ত কি গায়ে এতটুকুও নেই রে ?"

"সব বুঝলুম কিন্তু তুই করবি কি বলত' ?"

"ক'রব কি ? এইখানে মাটী নেব। জানি শয়তান বেটার সঙ্গে পারব না, তার লোক অনেক, কিন্তু তা বলে ত' কেউ আমায় এখানে মরতে বাধা দিতে পারবে না !"

"তুই কি আত্মহত্যা ক'রবি ?"

"তা কেন ? আগে চেষ্টা ক'রব আমার ভিটে রক্ষা করতে ; তার পর না হয় সেই চেষ্টাতেই জান দেব।"

দিলজান দেখিল স্বামীর মুখে একটা দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে আর কথা কহিল না। বাখরকে সে ভালই বুঝিত।—বুঝিত একবার সে যাহা করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে তাহা হইতে তাহাকে দুনিয়ার কোন লোকই বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

কাজেই সে উঠিয়া গিয়া এক বাটী ফেন ও খানিকটা লবণ লইয়া আসিয়া স্বামীকে খাওয়াইল। তাহার পর বলিল,—"তুই একটু ঘুমো, আমি ঘরের কাজগুলো সেরেনি।"

দিলজান চলিয়া গেলে বাখর একটু নিদ্রা যাইবার প্রয়াস পাইল কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। মন তাহার কেবলই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল,—"দুনিয়ায় এত অত্যাচার, এ রদ করবার কি কেউ নেই? দুনিয়ার মালেক খোদাও তাই নিশ্চিন্ত হ'য়ে দেখছেন? হা নসীব! আজ আমি গরীব বলেই না শয়তানটা আমায় এমন করে জব্দ করে দিলে!—আমার হ'য়ে লড়বার, আমার হ'য়ে কথা কয়বার কেউ নেই বলেই না! দুনিয়ায় কি গরীবের কেউ নেই—কেউ না?"

তাহার পর যখন তাহার উত্তেজনাটা একটু কমিয়া আসিল, তখন তাহার মনে হইল, এই বাস্তুভিটারই কথা। সেই তাহার দাদার আমল; তখন তাহারা এই খানেই ছিল, অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। তাহার পর তাহার অলস পিতার দোষে একটু একটু করিয়া তাহারা দরিদ্রতার অসীম গহ্বরে নামিয়া পড়িল। কিন্তু সেই বাল্যটা! আঃ কি মধুর সেই দিনগুলা তাহার কাটিয়াছে!

এই মাটির উপরই সে প্রথম হামাগুড়ি দেয়, তাহার পর ছোট ছোট পা ফেলিয়া টলিয়া টলিয়া চলা, তাহার পর স্থির পদে প্রথম দাঁড়ান, সবই এই মাটিতে হইয়াছে, আর আজ কিনা এই মাটি ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে? কখনই না!

হাত বাড়াইয়া সে দাওয়ার মাটি স্পর্শ করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল,—"দাদার মাটি, বাবার মাটি, আমার মাটি! তোকে ছেড়ে বেহেস্তে গিয়েও আমি সুখ পাব না!"—হাতটা তুলিয়া সে মাথায় ঠেকাইল। সঙ্গে সঙ্গে দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়িল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ বুজিল। তাহার পর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে জানে না।

[৩]

সেদিন রাত্রে ভয় ও উৎকণ্ঠায় দিলজানের একটুও নিদ্রা হয় নাই।

গভীর রাত্রিকালে সে ঘরের পার্শ্বে যেন দুই তিন জন লোকের চলাফেরার শব্দ পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। ভাল করিয়া কাণ পাতিয়া শুনিল, হাঁ তাহাই বটে!

সে বাখরকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল,—"ওরে ওঠ, লোক লেগেছে!"

বাখর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, অনুচ্চকণ্ঠে বলিল,—"আমার লাঠি ?"

দিলজান তাহার হাতে লাঠিটা তুলিয়া দিল। বাখর নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিল। বাহিরে বিরাট অন্ধকার। উপরে শুধু অসংখ্য তারকার ম্লান জ্যোতিঃ সেই অন্ধকার নাশ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল।

ভাল করিয়া দেখিতেই বাখর দেখিল অদূরে তিনটা লোক প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একজনের হাতে একটা দীর্ঘাকৃতি কি রহিয়াছে।

সাবধানে বাখর দাওয়া হইতে নামিয়া চালের ছাঁচতলে দাঁড়াইল।

লোক তিনটা কি পরামর্শ করিল। তাহার পর একটা লোক বাখরের শয়ন ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। রুদ্ধশ্বাসে বাখর তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

লোকটা অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল,—"ওরে দেশলাইটা ?"

একটা লোক অগ্রসর হইয়া কি একটা তাহার হস্তে দিল। বাখর কম্পিত বক্ষে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া অগ্রগামী লোকটার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর দৃঢ় মুষ্টিতে লাঠিটা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিল।

অগ্রবর্ত্তী লোকটা একটা দেশলাই জ্বালিয়া হস্তস্থিত মশালটা ধরাইয়া মটকায় আগুন ধরাইতে ব্যস্ত হইল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত বাখর বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া

উঠিল,—"জানটা রেখে যাও দাদা !"—কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্তস্থিত লাঠিটা প্রচণ্ড বেগে লোকটার মাথায় পড়িল।

"বাপ্!" বলিয়া লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইল।

সঙ্গে সঙ্গে আর দুইজন আসিয়া বাথরকে ঘেরিয়া ফেলিল। বাথর প্রাণপণ বলে লাঠি চালাইতে লাগিল। বিপুল উত্তেজনায় তাহার ক্ষত মুখগুলা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার চক্ষে দুনিয়া অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, পায়ের তলায় পৃথিবীটা যেন কুমারের চাকের মত ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে আর পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের দুর্বৃত্ত পাইকদ্বয় তাহাকে প্রহার করিল। বেচারা মাতালের মত টলিতে টলিতে শুইয়া পড়িল। ক্রমে একটু একটু করিয়া একটা বিরাট মসীরাশি তাহার সম্মুখের সমস্ত দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল। বেচারা শ্রম ও আঘাতের যন্ত্রণায় সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িল।

* * * * * *

বাথর যখন চোখ চাহিল, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। সে বিস্মিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিল, পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা তাহার একটুও মনে ছিল না। সহজ অবস্থার মত সে উঠিয়া বসিতে চাহিল কিন্তু পারিল না, বিপুল বেদনায় সে অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। পার্শ্বে দিলজান ও এলামৎ ছিল, তাহারা তাহাকে উঠিতে দিল না।

এলামৎ দিলজানের ভগিনীপতি। বাথর তাহাকে আপন

শয্যা পার্শ্বে দেখিয়া বিস্মিত হইল। ঘরটার চারিদিকে একবার চাহিতেই সে বুঝিতে পারিল, এ ঘর তাহার নহে! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

দিলজানের দিকে চাহিয়া বাথর প্রশ্ন করিল,—"এ আমি কোথা ?"

এলামৎ বলিল,—"এই যে ভাই, আমার বাড়ি!"

বিস্মিত ভাবে বাথর বলিল,—"তোমার বাড়ি—কেন ?"

দিলজান বলিল,—"আমাদের বাড়ি যে পুড়িয়ে দিয়েছে রে!"

"পুড়িয়ে দিয়েছে? এ্যাঁ, দিলজান, আমাদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে? কে রে? আমি কি তখন ম'রেছিলুম? আমার ঘর—আমার ভিটে, অন্য লোকে এসে পুড়িয়ে দিয়ে গেল, আর তুই তাকে কিছু বল্লি না? আমাকেও একবার খবর দিলি না ?"

"তোর কিছু মনে নেই বাথর, তুই ত' তাদের বাধা দিতে গিয়েই এমন জখম হ'য়েছিস!"

"আমি? ওঃ! মনে হয়েছে—এ সেই শয়তানের কাজ! আমার আর কি হয়েছিল রে ?"

"তুই লাঠি খেয়ে পড়ে গেছলি।"

"পড়ে গেছলুম? সেই আমার ভিটে—আমার বেহেস্তের ওপর পড়ে গেছলুম? মরিনি? এ্যাঁ, খোদা, তুমিও বাদ সাধলে? ম'রতেও দিলে না আমায়? সেই মাটি কামড়ে মরতেও দিলে না আমায়! হা নসিব! কেন আমায় এখানে নিয়ে এলি দিলজান? সেইখানেই আমায় মাটিচাপা দিলি না কেন? জানিস না তুই

সে মাটির ওপর আমার কত দরদ,—এই কলজেটা ফেটে যাচ্ছে দিলজান; কি ব'লব দেখাবার নয়, তা নইলে কলজে ছিঁড়ে দেখাতুম সেখানে কি আগুন জ্বলছে! আমার ভিটের ওপর শয়তানটা হেসে খেলে বেড়াবে, তাই দেখবার জন্যে এখনও আমি বেঁচে রইলুম! হা খোদা! আমি যাব—না, না, ওরে তোরা বাধা দিসনি, আমি যাব। সেই আমার মাটি—আমার মা—টি—"

উত্তেজিত ভাবে উঠিতে গিয়া বাখর ঘুরিয়া পড়িল; তাহার মুখদিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল। তাহার পর—তাহার পর সব ঠাণ্ডা।

অশ্রু।

"কেমন আছ মা, একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি ?"

রোগিনী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া কক্ষটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল ; তাহার পর পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—"আমি কোথায় ?"

"নবদ্বীপে, শ্রীধর আচার্য্যের বাড়ি !"

"এখানে—এখানে আমি কি করে এলুম ?"

"নদীতে ভেসে যাচ্ছিলে, গ্রামের লোকে তুলেছে তোমায় !"

"নদীতে ভেসে যাচ্ছিলুম ?—ওঃ ! হ্যাঁ, মনে পড়েছে !"—যুবতীর মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ সে কোন কথা বলিল না, তাহার পর ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে চাহিয়া করুণ-কণ্ঠে বলিল,—"কেন অভাগিনীকে মরতে দিলেন না ? এক কলঙ্কিনীকে দয়া করে ঘরে ঠাঁই দিয়ে ভাল করেননি কিন্তু—সমাজ আপনাকে একঘরে ক'রবে, কেউ আপনার বাড়ি আসবে না......" তাহার পর কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে আবার বলিল,—"আমি কুলত্যাগিনী !"

পার্শ্বোপবিষ্টা রমণী স্তম্ভিতা হইয়া গেলেন। কুলত্যাগিনী !—ব্রাহ্মণের নিষ্ঠাবতী বিধবা শেষে একটা অস্পৃশ্য কুলটার সেবায় নিযুক্তা ! কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন ; তাহার পর দৃঢ় কণ্ঠে রোগিনীকে বলিলেন,—"না,

তুমি কুলত্যাগিনী নও। এত সারল্য, এমন নিষ্কলঙ্কভাব কুলটার মুখে থাকতে পারে না……"

"না, না, আগে আমার কথা শুনুন, আমার জীবনের ইতিহাস শুনুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই ক'রবেন। না জেনে শুনে আগে থেকে কিছু স্থির করবেন না, এই আমার অনুরোধ।"

"বেশ তোমার বক্তব্যটাই বল আগে শুনি।"

রোগিনী ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল ;—

আমি কুলীন কন্যা ; বাবাকে কোন দিন দেখি নাই ; মাতুলালয়েই মাতার সহিত আমি বাস করিতাম। আমার জন্য পরাধীনা জননীকে অনেক বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত বলিয়া কোন দিন তিনি আমায় স্নেহ-চক্ষে দেখেন নাই। বাল্য হইতেই আমি অনাদরে অভ্যস্তা।

মাতাকেও আমি অধিক দিন পাইলাম না। আমার ছয় বৎসর বয়সের সময় একদিন ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে মাতুল ও মাতুলানীর অনাবশ্যক গলগ্রহ হইয়া উঠিলাম। সেই শৈশবে মাতৃহারা হইয়া আমি বুঝিতে পারিলাম না, সংসারের কি শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অভাগিনী আমি, এই শৈশবেই হারাইয়া ফেলিলাম।

মাতুলানী দুইবেলা দুইমুঠা ভাত দিতেন, কিন্তু, সেই অন্ন-মুষ্টির পরিবর্ত্তে, তিনি আমার প্রতি যে রূঢ় আচরণ করিতেন ও যে পরিমাণ কাজ আদায় করিয়া লইতেন, ভদ্রলোকের বাড়ির দাসী-চাকরও বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা ভোগ

করিয়া থাকে। মাতুলানীর তিন বৎসরের কন্যা যতক্ষণ জাগিয়া থাকিত ততক্ষণ আমাকেই তাহাকে লইয়া থাকিতে হইত। ক্রোড়ে লইয়া বা একস্থানে বসিয়া তাহার সহিত খেলা করা আমার অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। দুরন্ত বালিকা সুধা জানালা ধরিয়া খেলা করিতে করিতে পড়িয়া গেলে বা শিশুসুলভ চাপল্য বশে ছুটিতে গিয়া পড়িয়া গেলে, দোষ হইত আমার ;—এবং আমার এই স্বেচ্ছাকৃত (!) অপরাধের জন্য সাজাও পাইতে হইত যথেষ্ট। কিল চড় ত' নিত্যকার ব্যাপার, কখনও কখনও পদাঘাত বা তৎপরিবর্ত্তে উপবাসও বরাদ্দ হইত। এমনি স্নেহ ও শাস্তির মধ্যে আমি মানুষ হইতে লাগিলাম।

মামা বাবু আমায় একটু স্নেহ করিতেন বলিয়াই মনে হইত। একদিনের কথা মনে আছে ; মামা বাবু অফিসের পোষাক পরিতেছিলেন, মামী মা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন ; আমি সুধাকে কোলে করিয়া পানের ডিবাটা আনিয়া মামা বাবুর হাতে দিলাম।

একটা একটা করিয়া দুইটা পান মুখে পুরিয়া চুণ খাইতে খাইতে তিনি আমার দিকে চাহিয়া মামী-মাকে বলিলেন,—"অশ্রুটা দিন রাত তোমার মেয়ে ব'য়ে ব'য়ে দিন দিন যেন পেঁকাটি হ'য়ে যাচ্ছে!"

মামী-মা মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ গো, কবে তোমার ভাগ্নি থোড়ের টুকরো ছিল যে আজ আমার মেয়ে বয়ে পেঁকাটি হ'য়ে গেল? আর তুমি অমনি করে আসকারা দাও বলেইত'

ছুঁড়ি সারাদিনের মধ্যে একটা কুটি ভেঙ্গে সংসারের উপকার করে না!”

মামাবাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন; নিরীহ ভালমানুষ তিনি; মামী-মাকে বিলক্ষণ ভয়ও করিতেন; কাজেই মামী-মার ঝঙ্কার শুনিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশে বলিলেন,—“বটে! মেয়েটা এমন হারামজাদা বুঝি? কি ক'রে জানব বল, আমি মনে করি বুঝি সারাদিনই কাজ কর্ম্ম করে! হুঁঃ! কলিকাল কিনা!”—তাহার পরই তাড়াতাড়ি চাদর খানা কাঁধে ফেলিয়া তিনি অফিস চলিয়া গেলেন।

মামী-মার কথা শুনিয়া আমার যত না রাগ হইয়াছিল, দুঃখ হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ! সারাদিন সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও নাম নাই! অশ্রু আমার কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। ধীরে ধীরে সুধাকে লইয়া আমি সেখান হইতে সরিয়া গেলাম।

আমার যখন এগার বছর বয়স সেই সময় একদিন যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে দিন রবি বার; মামাবাবু সকালে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি আমার নিত্যকার কাজ করিতেছিলাম; সুধার বদলে সুকুমার এবার আমার আরোহী হইয়াছিল। মামী-মা বলিলেন,—“ওলো অশ্রু বাগান থেকে গোটা চারেক বেগুণ তুলে আনত'!”

রন্ধন গৃহের পার্শ্বেই ক্ষুদ্র সবজীর বাগান। আমি সুকুমারকে কোলে লইয়া বেগুণ তুলিতে গেলাম। ক্ষেত্রের পার্শ্বে সুকুমারকে

বসাইয়া আমি দুই তিনটা বেগুণ তুলিয়াছি এরূপ সময়ে সুকুমার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ত্বরিতে ফিরিয়া আমি যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার ভয়ের সীমা রহিল না, স্পষ্টই বুঝিলাম অদৃষ্টে অনেক লাঞ্ছনা আছে।

ব্যাপারটা এই। সুকুমার তখন সবে অল্প অল্প হাঁটিতে শিখিয়াছে। আমি তাহাকে বসাইয়া আসিবার পরই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাহার পর একটা কিছুতে পা বাধিয়া সে পড়িয়া যায়। সেই স্থানে কতকগুলা ইট ছিল, তাহারই একটা তাহার কপালে বিঁধিয়া যাওয়ায় কপালটা কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতে থাকে।

আমি তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া কোলে তুলিলাম, তাহার পর দুই পদ অগ্রসর হইতেই মামী-মার সাক্ষাৎ পাইলাম; পুত্রের ক্রন্দন শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তিনি দ্রুতপদে সেই দিকে আসিতেছিলেন। সুকুকে রক্তাক্ত দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে আমার নিকট হইতে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন এবং দ্রুতপদে জলের টবের নিকট গমন করিলেন। ভয়-ব্যাকুল-প্রাণে আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। অদৃষ্টে কি আছে কে বলিয়া দিবে?

সুকুর ক্ষত স্থান ধুইয়া মুছিয়া বাঁধিয়া দিয়া ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর মতই তিনি আমায় আক্রমণ করিলেন;—"হারামজাদী, পাজীর পা ঝাড়া মেয়ে!"—বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত ও পদের ব্যবহার রীতিমত চলিতেছিল। এত করিয়াও কিন্তু তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না। এক কোণে একটা শ্লেট ভাঙা পড়িয়াছিল; ক্রোধের

মাত্রাধিক্যে তিনি সেইটাই আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন। আমি এজন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না; অতর্কিতে সেটা মস্তকে বিদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সংজ্ঞা হারাইলাম।

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিলাম আমার নির্দ্দিষ্ট মলিন শয্যায় আমি শায়িত; শরীরটা অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং মাথায় একটা বৃহৎ পটি বাঁধা রহিয়াছে।

মাথার দিকে দাঁড়াইয়া কে বলিতেছিল,—"আর কোন ভয়ের কারণ নেই। অনেকটা রক্ত বেরিয়ে যাওয়াতেই জ্বরটা এত জোর করেছিল, আর সেই জন্যেই রোগিনী এই পাঁচদিন অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল। মাথার ঘা'টায় "আইডোকরম" দিয়েছি, শীগ্‌গিরই শুকিয়ে যাবে'ক্ষণ। জ্বরটাও আর দু' এক দিনের মধ্যেই বন্ধ হবে।"

তাহার উত্তরে যিনি কথা বলিলেন তাঁহার কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম তিনি মামাবাবু। মামাবাবু বলিলেন,—"যাই হোক সেরে উঠলেই এখন বাঁচা যায়, আমার ভারি ভয় হ'য়ে গেছল, না জানি কি হবে!"

তাহারপর উভয়ে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি একাকী বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম।

জ্বরটা দুই চারি দিনেই সারিল বটে কিন্তু মাথার ক্ষত সারিতে পূর্ণ তিন মাস লাগিয়াছিল। মামী-মা ইহার পর হইতে কোন দিন আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই;—কিন্তু কি যে

আমার অপরাধ তাহা আমি এপর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

এমনি একটানা অশান্তি ও তিরস্কারের মধ্যে আমার বাল্য ও কৈশোরটা কাটিয়া গেল; কিন্তু কোনদিন মামা-বাবু বা মামী-মাকে আমার বিবাহের জন্য কোন চেষ্টা করিতে দেখিলাম না। তাহার পর যে দিন সকালে উঠিয়া পৃথিবীটাকে বড় সুন্দর মনে হইল, প্রাণের মধ্যে বসন্তের মলয়ানিল খেলিতে লাগিল সেইদিন অতর্কিতে শুনিয়া ফেলিলাম আর এক সপ্তাহ পরে আমার বিবাহ।

বিবাহের কথা শুনিয়া প্রাণ আমার আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ছিল কিনা ঠিক মনে নাই, তবে এটা বেশ মনে আছে যে স্বাধীনতার সম্ভাবনায় আমি একটা মুক্তির শ্বাস ফেলিয়াছিলাম।

বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়দিন বেশ স্বচ্ছন্দতার মধ্যেই কাটিয়া গেল; কিন্তু বিবাহের দিন সকাল হইতে একটা নূতন চিন্তা আমার মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল;—যাঁহার হস্তে জীবন-যৌবন সমস্তই অর্পণ করিতে হইবে তিনি কেমন লোক?

বিবাহের রাত্রিটা গোলমালের মধ্যেই কাটিয়া গেল। শুভ-দৃষ্টির সময় চকিতের মত একবার আমি স্বামীর মুখ দেখিয়াছিলাম কিন্তু সেই ক্ষণিকের দেখাতেই, আলোকচিত্রের কলের মধ্যে যেমন করিয়া বাস্তবের ছবি উঠিয়া যায় তেমনি করিয়াই আমার হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি আঁকিয়া গেল। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়াই আমি নূতন জীবনে, নূতন সংসারে প্রবেশ করিলাম।

নূতন সংসারে পা'দিতেই বুঝিতে পারিলাম বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতেই তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"নরুর যেমন কাণ্ড, সাত ছেলের মা'কে বে ক'রে এনেছে।" কথাটা বোধ হয় আমার স্বামী শুনিতে পান নাই কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সবটুকুই আমি বেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পাইয়াছিলাম।

যাহা হউক এমনি অনাদর ও উপেক্ষাই আমায় নূতন সংসারে বরণ করিয়া লইল। আমি নূতন সংসারে নূতনের মধ্যে আমার আসনখানি সসঙ্কোচে এক পার্শ্বে পাতিয়া লইলাম।

স্বামী আমার একটা চট কলের বড় বাবু ছিলেন। তিনি অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিতেন এবং এরূপ পাপের পয়সা হাতে আসিলে লোকে সাধারণতঃ যাহা করিয়া থাকে তিনিও তাহাই করিতেন; অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করা তাঁহার অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীও কোনদিন তাঁহাকে একার্য্যে বাধা দেন নাই,—বাধা দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। মধ্যে মধ্যে আবার তিনি রাত্রে বাটী ফিরিতেন না, বাহিরে বাহিরে সমস্ত দিন রাত কাটাইয়া পরদিন বৈকালে কলের ছুটি হইলে ফিরিয়া আসিতেন।

আমার বিবাহের পর প্রায় মাসাবধিকাল তাঁহাকে এসব কিছুই করিতে দেখি নাই, দিব্য শান্ত-শিষ্টের মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজে যাইতেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফিরিতেন। পুত্রের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্বশ্রূঠাকুরাণী আমার

উপর তুষ্ট হইয়া উঠিতে ছিলেন। কয়েক দিনের জন্য আমার মনে হইয়াছিল, বুঝি অসুখী হইবার আশঙ্কাটা আমারই ভ্রমের ফল।

মাস দুইএর মধ্যেই কিন্তু আমার আশা চূর্ণ হইয়া গেল। নূতনের আকর্ষণেই বোধ হয় এতদিন স্বামী আমার মদ্যপান বন্ধ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পুরাতন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁহার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিল। সে রাত্রে শয়ন করিতেই স্বামী জড়িত স্বরে কি বলিয়া আমায় চুম্বন করিতে আসিলেন; কিন্তু ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ হইবার পূর্ব্বেই আমার মুখমণ্ডলে মুখ রাখিয়া তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। আঃ! কি বিশ্রী দুর্গন্ধই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল! আমি ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক তুলিয়া উপাধানে রাখিয়া দিলাম, তাহার পর একটু দূরে সরিয়া শয়ন করিলাম। আমার তখন কান্না পাইতেছিল,—এই স্বামী! ইহাকেই সেবা-ভক্তি করিয়া আমার জীবনের অবশিষ্ট কালটা কাটাইতে হইবে? হারে অভাগিনীর অদৃষ্ট!

তাহার পরদিন রবিবার; স্বামী যখন শয্যাত্যাগ করিলেন তখন বেলা প্রায় দশটা। সকাল হইতেই শ্বশ্রূর মুখখানা ভার ভার দেখিলাম, কিন্তু কেন যে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমায় দেখিয়া তিনি কোন কথা বলিলেন না, আপনার মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অন্য দিন আমিই রন্ধন করিতাম কিন্তু সেদিন দেখিলাম তিনি স্বয়ংই রন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক

সাধ্য সাধনা করিয়া তবে সেদিন তাঁহাকে রন্ধন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলাম !

এই দিন হইতে আমার সুখের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। আমার কর্ম্মের মধ্যে কোন একটা খুঁত বাহির হইলে কোন মতেই সেটা তিনি মার্জ্জনা করিতে পারিতেন না, ক্ষুদ্রতম দোষের জন্যও আমার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদিগকে নরকস্থ করিতেন। সংসারের এই সুখ এবং স্বামীর ঐ অপূর্ব্ব সোহাগের মধ্যেই আমার দিন কাটিতেছিল। মনের মধ্যে একটুও সুখ ছিল না, শরীরের প্রতিও কোন মমতা ছিল না, কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই আমার শরীর ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। অপূর্ণ যৌবন ফুটিবার পূর্ব্বেই বার্দ্ধক্য আসিয়া দেখা দিল। প্রায় দেড় বৎসর পরে আমার জ্বর আরম্ভ হইল।

কয়েকদিন উপর্য্যুপরি জ্বর হওয়ায় আমি সেদিন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম ; বৈকালে আর কোন মতেই কাজ করিতে পারিলাম না, অগত্যা শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। সন্ধ্যার সময় স্বামী আসিতেন, শ্বশ্রূ ঠিক তাঁহার গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই পাড়া বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিতেন। সেদিন বাড়ি ফিরিয়াই তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—"ভাল গতরখাগিকে বাড়ি এনেছিলুম, সন্ধ্যাটা অবধি দিতে পারে না।"

তাহার পর সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া যখন তিনি দেখিলেন কোন কাজই আমি করি নাই, তখন আর তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। আমি যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম, মহাক্রোধে তিনি সেই

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন,—"হ্যাঁলা, তুই মনে ঠাউরেছিস কি বলত' ?"

আমি বলিলাম,—"আজ আর আমি কোন মতেই উঠতে পারলুম না মা, শরীরটা বড় ক্লান্ত হ'য়েছে।"

রায়-বাঘিনীর মত তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"বটে ! গেলবার বেলা ত' অসুখ করে না ? চ', ওঠ, কাজ তোকে ক'রতেই হবে।"

আমি বলিলাম,—"তা আমি কিছুতেই পারব না।"

"আমার মুখের ওপর চোপা, হারামজাদী, হাঘোরের মেয়ে !"—বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বিছানার উপর হইতে টানিয়া আনিয়া কয়েকটা কিল ও চড় বর্ষণ করিলেন।

এই সময় আমার স্বামী কল হইতে বাড়ি ফিরিলেন। মাতা ও পত্নীকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"ব্যাপার কি মা ?"

মাতা সংক্ষেপে কথাগুলা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন,—"যেমন ছোট লোকের বুড়ো মেয়ে ঘরে এনেছিস তাতে এতদিন যে মুখের ওপর চোপা কেন করেনি সেই আশ্চয্যি।"

স্বামী আমার একটা কথাও না শুনিয়া জুতাপরা পায়ে উপর্য্যুপরি কয়েক ঘা পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—"বেরিয়ে যা এখান থেকে, এ বাড়ীতে তোর জায়গা হবে না।" তাহাতেও আমি উঠিলাম না দেখিয়া আমার হাত ধরিয়া তিনি বাড়ির বাহির করিয়া দিলেন এবং সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি একটা কথাও বলিলাম না—বলিবার ইচ্ছাও ছিল না।

তখন আমার বুকের মধ্যে যে কি যন্ত্রণা, কি দুঃখের উর্ম্মি উছলিয়া উঠিতেছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কোথায় যাইব আমি, কাহাকেই বা চিনি? দ্বারের পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া আমি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম;—কি করিব তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না।

অকস্মাৎ কে বলিয়া উঠিল,—"কেগা? বৌদি? তুমি এখানে যে?"

মুখ তুলিয়া দেখিলাম আগন্তুক আমাদের প্রতিবেশী হেম। আমার মনে একটা সংকল্প জাগিল। তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলাম,—"ঠাকুর পো, একটা কাজ ক'রবে? আমায় মামার বাড়ী রেখে আসবে?

"মামার বাড়ী? কবে?"

"আজ, এখুনি।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল,—"আচ্ছা এস ঘাটের দিকে যাই, যদি নৌক টৌক পাই ত' দেখি গে।"

আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম।

ঘাটে আসিয়া অল্প চেষ্টাতেই একখানা নৌকা মিলিল। আমি ছাউনীর মধ্যে অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। হেম বাহিরে বসিয়া রহিল।

কখন আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, অকস্মাৎ কাহার করস্পর্শে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। অনুভবে বুঝিলাম পার্শ্বে কে শয়ন করিয়া আছে। তাহার হাতখানা আমার বক্ষের উপর ন্যস্ত।

অন্ধকার থাকায় লোকটাকে চিনিতে পারিলাম না। আমি তাহার হাতখানা সরাইয়া দিলাম। দুর্বৃত্ত পুনরায় আমায় আলিঙ্গন করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে এক বীভৎস প্রস্তাব করিল ; আমার অন্তরাত্মা তাহার কথায় বারম্বার শিহরিয়া উঠিল,—সমস্ত প্রাণের মধ্যে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জোর করিয়া তাহার আলিঙ্গন পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া আমি বাহিরে আসিয়া সহসা নদীবক্ষে ঝাঁপ দিলাম। হেম এটা মনে করে নাই, কাজেই সেজন্য সে প্রস্তুতও ছিল না। তাহার পর যাহা হইয়াছে তাহা আপনি ভালই জানেন। এখন বুঝুন আমায় আশ্রয় দিলে আপনার কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা।

অশ্রু নীরব হইল।

পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণী অশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন,—"কিছু ভেব' না মা, তুমি স্বচ্ছন্দে আমার কাছে থাক। সংসারে এ বিধবার আর একজনও আত্মীয় নেই, সুতরাং সমাজকেও আমি বড় একটা ভয় করি না। আর তা ছাড়া তোমায় কুলত্যাগিনী কোন মতেই বলা যায় না ; এক জড় ব্যতীত আর কেউ মুখ বুজে এত অত্যাচার সহ্য ক'রতে পারে না। আমি হ'লেও ঠিক এমনি করতুম।"

আঁখির মোহে।

রামসিং ছিল জাতিতে শিখ !

আমি যে বাবুর বাড়ীতে চাকুরী করিতাম, রামসিং একদিন সেই বাড়ীতে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এই দিন তাহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।

একটু একটু করিয়া আমাদের আলাপটা যতই জমিতেছিল, ধীরে ধীরে আমি ততই তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছিলাম। লোকটা যেমনি অমায়িক তেমনি সরল প্রাণ। মধ্যে মধ্যে সে তাহার অতীত জীবনের কথা দুই একটা আমায় বলিত। পূর্ব্বে সে সৈন্য বিভাগে চাকুরী করিত ; কেমন করিয়া একদিন সে একা অসংখ্য শত্রু সৈন্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল, কি করিয়া সে দুই একটা শত্রু মারিয়া সেই অরাতি সমুদ্র সন্তরণ করিয়া আপন দলে আসিয়া মিলিয়াছিল, কেমন করিয়া একদিন শত শত 'সাদা অদমী' তাহাদের বিদ্রোহের অনলে আত্মাহুতি দিয়াছিল, সেই কথা সে প্রায় আমায় বলিত। কাজের ভিড়ে দিনের বেলা আমরা গল্প করিবার অবসর পাইতাম না, একমাত্র অবসর জুটিত রাত্রে সকলের আহারাদির পর। আমি মুগ্ধ হইয়া সেই সকল কথা শুনিতাম,—সময় সময় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িতাম। মনে হইত যেন আমিই স্বয়ং এই সকল কীর্ত্তির কর্ত্তা ! শরীর শিহরিয়া উঠিত, ধমনীতে রক্তের স্রোত দ্রুততর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত, মনে হইত, এমন না হইলে আর জীবন !

মধ্যে মধ্যে রামসিং বড় গম্ভীর, বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িত। সেদিন চেষ্টা করিয়াও তাহাকে কথা কহাইতে পারিতাম না। কি যেন একটা কিসের ছায়া আসিয়া তাহার হাস্য-চটুল সরল প্রাণখানিকে ঢাকিয়া ফেলিত; তাহার সেই স্নেহ-করুণ চোখ দুইটী আগুনের ভাঁটার মতই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত; সেই দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টি বিনিময় হইলে আমি শিহরিয়া উঠিতাম। উঃ! কি হিংস্র দৃষ্টি সে চাহনীতে!

সেদিন দোল-পূর্ণিমা। উপরে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিলেন, নিম্নে ধরিত্রীর ক্রোড়ে সমস্ত জগত নিদ্রিত। রাত্রি তখন প্রায় এগারটা হইবে; হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল; চাহিয়া দেখি রামসিং পাশে নাই, মনে করিলাম হয়ত বাহিরে গিয়াছে, এখুনি আসিবে। তাহার অপেক্ষায় শুইয়া রহিলাম; ক্রমে কলের পেটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল, কিন্তু রামসিং কই? কি জানি কেন আমি কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম, কিছুতেই আর আমার ঘুম আসিল না। শয্যা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলাম।

জোৎস্নার আলোকে বাড়ীর উঠানটা ঠিক দিনের মতই আলোকময় হইয়া উঠিয়াছিল। দুই পদ অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম রামসিং গম্ভীর মুখে একটা থামের পার্শ্বে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া আছে!

আমি ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া তাহার স্কন্ধের উপর একখানা হাত রাখিয়া ডাকিলাম,—"দোস্ত!—"

সে চমকিয়া আমার দিকে চাহিল, কিন্তু একটা কথাও বলিল না। তাহার চোখের দিকে চাহিতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম,—সেই দৃষ্টি!

কিন্তু আজ আমি ভয়কে মনে স্থান দিব না সংকল্প করিয়াছিলাম, কাজেই চোখ নামাইয়া লইয়া আমি তাহার পাশে বসিলাম। তেমনি ভাবে আবার ডাকিলাম,—"দোস্ত!"

এবার সে কথা কহিল; বলিল,—"কি?"

"তোমার কি হ'য়েছে?"

সে বলিল,—"কই কিছু না ত'!"

আমি বলিলাম,—"না কি? আমি প্রথম থেকে লক্ষ্য ক'রে আসছি, মাঝে মাঝে তুমি কেমন একরকম হ'য়ে যাও; কেন, ব'লবে না?"

রামসিং কোন কথা কহিল না; নীরবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি আবার বলিলাম,—"আমায় বিশ্বাস হয় না দোস্ত?"

এবার সে বলিল,—"হয়!"

"তবে?"

"শুনে তোমার কোন লাভ নেই।"

"তা হ'ক, তবু আমি শুনতে চাই।"

সে নীরবে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল,—"তবে শোন।"

সে বলিতে লাগিল,—"আমি তখন বারাকপুর ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে

থাকি। একবার হঠাৎ আমার বড় অসুখ হয়; সৈন্যদের অসুখ হ'লে যেমন চিকিৎসা হয় তাতে আমার ক্রটী হয়নি; কিন্তু আমার সেই অবসর কালটুকু মধুরতম করে তুলেছিল আর একজন,—সে আমাদের রেজিমেণ্টের ক্যাপ্‌টেনের মেয়ে রোজামণ্ড! এই দীন দরিদ্র সুবেদারের জন্যও তার সরল কোমল প্রাণে কতখানি জায়গা ছিল! সেই অসুখের সময় সেবা-পরায়ণা রোজামণ্ডকে দেবী বলেই মনে হ'য়েছিল। দেবীর মত আমি তাকে ভক্তি করতুম।

"রোজামণ্ড ইংরেজের মেয়ে, ইংরেজের মতই সে সুন্দরী ছিল। কিন্তু সকলের চেয়ে সুন্দর ছিল তার কাল কাল বড় বড় চোখ ছটি! সেই চোখ ছুটির স্নেহ-ঢল-ঢল চাহনী আমায় দিন দিন পাগল ক'রে তুলছিল। প্রথমটা আমি তা বুঝতে পারিনি।

"একদিন রাত্রে গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলুম, সেদিনও এমনি চাঁদনীর রাত, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে; কাছেই ফোর্ট। হঠাৎ একটা ছায়া প'ড়ল, চেয়ে দেখলুম ক্যাপ্‌টেন আসছেন। এই ক্যাপ্‌টেন লোকটা মোটে ভাল ছিল না; আমি ছুচক্ষে তাকে দেখতে পারতুম না। চিরদিন তার সঙ্গে আমার মনের গরমিল ছিল।

"ক্যাপ্‌টেন আমার গা ঘেঁসে ধাক্কা মেরে চলে গেলেন। আমার মাথা থেকে পা অবধি রাগে কাঁপতে লাগল'। স্পষ্টগলায় তাঁকে বল্লুম,—'সাহেব তুমি আমার ওপর-ওয়ালা তা জানি, কিন্তু অপমান করবার তোমার কোন এক্তিয়ার নেই।'

"সাহেব হো হো শব্দে হেসে উঠল। হাসিটা থামলে বললেন,—'কেন তোমরা কি বাদসা, না নবাব ?'

"আমি বল্লুম,—'বাদসা-নবাব না হ'লেও ভদ্রবংশে জন্ম আমার ; শিখ জাত কখনও মুখ বুজে অপমান সইতে পারে না—শেখেনি।'

"আবার তেমনি ভাবে হেসে সাহেব বল্লেন,—'বটে! তা' আর ত' তোমরা শিখ থাকছ না সুবেদার সাহেব, খৃষ্টান হ'য়ে গেছ যে! টোটা সম্বন্ধে কোন কথা শোননি বুঝি ?'

"তখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে জলে ওঠবার উপক্রম হচ্ছিল। সাহেবরা যে আমাদের জাত মারবার জন্যেই এই দম্‌দম্ বুলেটগুলার প্রচলন করেছিল এ জনরবটা চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্যুদ্দীপ্তির মত কথাটা আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আমি চকিতে পকেট থেকে পিস্তলটা বার ক'রে সাহেবের দিকে লক্ষ্য করলুম।

"একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দ আমার কাণে গেল, চেয়ে দেখলুম সেই জ্যোৎস্নালোকে স্বর্গের পরীর মত রোজামণ্ড আমাদের কাছে কি-জানি-কখন এসে দাঁড়িয়েছে! সেই ঢল-ঢল চোখ দুটি তার তখন করুণা ও বিনয়ের ভাবে ভরে উঠেছে! একটি দৃষ্টি, ব্যস! আমার হাত কেঁপে উঠল, বুকটা চঞ্চল হ'য়ে উঠল, তাড়াতাড়ি পিস্তলটা পকেটে পুরে ফেললুম।

"রোজার চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলুম। ক্যাপ্‌টেন রোজার হাত ধরে ফোর্টে ফিরে গেলেন।

"তারপর একমাসও কাটল না। বিদ্রোহের সর্ব্বগ্রাসী আগুণ ধূ-ধূ জ্বলে উঠল। ক্যাপ্‌টেন মেয়েকে নিয়ে কোলকেতায় চলে গেলেন। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম, মনে হ'ল এই হয়ত শেষ দেখা। আমি তার কর চুম্বন করে বিদায় সম্ভাষণ জানালুম। উত্তরে সে শুধু একটু হাসলে।

"আমরা মিরাটের দিকে ছুটলুম। চারিদিকে বিদ্রোহ—একটা প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা আগুণের হল্কার মত দিকে দিকে ছুটছিল। চারিদিকে শ্বেতাঙ্গ আক্রমণ ও হত্যা! যুবকযুবতী, বালক-বৃদ্ধ, পুরুষ-রমণী বিদ্রোহীরা কা'কেও ছাড়ছিল না।

"একটা উত্তেজনা, একটা শোণিত পিপাসায় আমাদের অন্ধ, উন্মত্ত করে তুলেছিল। নানা দেশ ঘুরে শেষে আমরা লক্ষ্ণৌ পৌঁছুলুম। এখানে কর্ত্তা ছিলেন খোদ নানা সাহেব। প্রথম দিনটা বেশ কেটে গেল; দ্বিতীয় দিন সকালে আমাদের ডাক প'ড়ল নানা সাহেবের কাছে।

"নানা সাহেব বল্লেন কতকগুলো ইংরাজ ধ'রে রাখা হ'য়েছে, তাদের খুন ক'রতে হবে। কিন্তু কে ক'রবে? তখনই লটারী ক'রে স্থির করা হ'ল; লটারীতে নাম উঠল আমার! এতে আমি একটুও ক্ষুণ্ণ হলুম না, উৎসাহে, গর্ব্বে, আমার বুক ফুলে উঠল!

"নানা সাহেবের হুকুমে তলোয়ার হাতে আমি গারদে ঢুকলুম। অসংখ্য বালক, যুবক ও রমণীতে কক্ষটা পূর্ণ ছিল। এদেরই আমায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ক'রতে হবে! আহা, অভাগাগুলোর

মুখের ভাব মনে হ'লে এখনও প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে ! কিন্তু না, সৈনিক আমি, দয়া মায়ার স্থান আমার কাছে নেই। আমি তখনই প্রাণকে কঠিন ক'রে তুললুম।

"তলোয়ার তুলিছি, প্রথম মেম সাহেবকে মারবো, এমন সময় সামনে চোখ পোড়ল, চেয়ে দেখলুম—সেই চোখ দুটি ! প্রাণ আমার আনন্দে নেচে উঠল। সৈনিকের কর্ত্তব্য, নিজের মান, ইজ্জত, কথার দাম, সমস্ত সেই চোখের মোহে ভুলে গেলুম। উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে নানা সাহেবকে বল্লুম,—'সাহেব একাজ আমি পারব না।'

"নানা আমার দিকে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমার সেই উদ্‌ভ্রান্তভাব, সেই চাঞ্চল্য দেখে আর সবাই বোধ হয় আমায় পাগল ঠাউরেছিল। আমার প্রাণ কিন্তু তখন রোজাকে কি উপায়ে উদ্ধার ক'রব এই কথা ভেবেই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল।

* * * * *

"অন্ধকার রাত্রি। ঘোড়ার ওপর আমি, আর আমার কোলের ওপর আমার চির আকাঙ্ক্ষিতা দেবী,—রোজামণ্ড ! সে শক্ত ক'রে আমায় ধরে ছিল ; তার ভয় ব্যাকুল কোমল বুকখানির স্পন্দন আমি আমার বুকের ওপর স্পষ্ট অনুভব ক'রছিলুম।

"পেছনে তখন জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে নানার লোক আমাদের ধ'রতে আসছিল। মাঝে মাঝে তারা বন্দুকও ছুঁড়ছিল, কিন্তু অন্ধকার রাত্রি ব'লে সে গুলির একটাও আমাদের কাছে এসে পৌঁছুল না।

"আমরা প্রাণ পণে ঘোড়া ছুটিয়ে চল্লুম ; কোথায় যাচ্ছি তা দেখবার অবসর ছিল না ; আর অবসর থাকলেও সেই ঘুট ঘুটে অন্ধকারে দেখা কোন মতেই সম্ভবপর নয়।

"অনেকটা পথ চলে আসবার পর আমরা একটা জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লুম। পেছনে যারা তাড়া ক'রে আসছিল তাদের কোন সাড়া শব্দ পেলুম না ; আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

"ঘোড়ার রাশটা আলগা করে, তাকে যথেচ্ছভাবে যেতে দিয়ে আমি রোজামণ্ডকে বুকের ওপর চেপে ধরলুম ; তার মুখের কাছে মুখ এনে ডাকলুম,—'রোজি, রোজি, দেবী আমার !'

"রোজামণ্ড আমার সেই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে বেশ নিশ্চিন্তভাবেই বসে রইল, একবারও ছাড়াবার চেষ্টা করলে না। আমি ধীরে ধীরে, তার গালে একটি চুম্বন ক'রলুম। রোজামণ্ড তাতেও আমায় বাধা দিলে না। তারপর ক'মাস আমরা সেই বনের ভেতর স্বামী স্ত্রীর মত সুখে দিন কাটাতে লাগলুম ; কিন্তু বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নি ; কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রে, প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে আমি যে পাপ ক'রেছিলুম শীঘ্রই তার প্রায়শ্চিত্তের সময় এল।

"সে দিন সহর থেকে ফিরতে আমার একটু রাত হ'য়েছিল, ফিরে দেখি কুটীরে রোজামণ্ড নেই। তার খোঁজে বাইরে এসে যা দেখলুম, তাতে আমার হিতাহিত জ্ঞান, ভাল মন্দের বিচার সব ঘুচে গেল, ক্ষোভে দুঃখে আমি উন্মাদ হ'য়ে উঠলুম।

"জ্যোৎস্না রাত্রি,—আমার ঘরের কাছে একটা খোলা মাঠ

ছিল। চাঁদের আলো মাঠের উপর চন্দ্রাতপের মতই ঝলমল ক'রছিল, আর সেই মাঠের উপর দেখলুম রোজামণ্ড,—আমার রোজা একটা ইংরেজ পুরুষের হাত ধ'রে বেড়াচ্ছে! লোকটা কে আমি চিন্‌তে পারলুম না; গোঁফ দাড়ি কামান, ছোকরা বলেই মনে হ'ল।

"শত বৃশ্চিক দংশনের মত, রোজা অবিশ্বাসিনী, এই কথাটা ঘুরে ফিরে আমার বুকে বিষের লহর তুলে দিতে লাগল।

"ছুটে আমি ঘর থেকে আমার দোচোঙ্গা রাইফেলটা টোটা ভরে নিয়ে এলুম। তারপর রোজামণ্ডের দিকে পাগলের মত ছুটে চল্‌লুম।

"চেঁচিয়ে বললুম,—'রোজা—রাক্ষসী—অবিশ্বাসিনী!—'সঙ্গে সঙ্গে গভীর নির্ঘোষে আমার বন্দুক গর্জ্জে উঠল। একটা, তারপর আর একটা, অব্যর্থ সন্ধানে রোজা এবং তার পাপের সহচর প্রায় একই সঙ্গে আর্ত্তনাদ করে পড়ে গেল। একটা কথাও তাকে বলবার সময় দিইনি।

"ছুটে আমি অবিশ্বাসিনীর মৃত্যু দেখতে গেলাম; কিন্তু কাছে গিয়েই দারুণ অনুশোচনায় আমার প্রাণ ভরে উঠল। যাকে আমি রোজামণ্ডের প্রণয়ী ভেবেছিলুম, সে প্রণয়ী নয়, তার বাপ,—আমার মনিব ক্যাপ্‌টেন টম!

"অনুশোচনার তীব্র আগুনে আমার প্রাণ পুড়ে যেতে লাগল। যে আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিল তারই বুকে আজ আমি নিষ্ঠুরভাবে গুলি চালিয়েছি!

"ভেবে দেখ, নবীন, তখন আমার প্রাণে কি নরকের আগুন জ্বলছিল!"—রামসিং নীরব হইল। শোকে দুঃখে মুহ্যমান সে আবার বলিল,—"জ্যোৎস্না রাত্রি দেখলে এখনও আমার সেই দশ বছর আগেকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই মৃত্যু-ছায়া-ম্লান রোজামণ্ডের চোখ দুটী! উঃ! এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি! ঐ চাঁদের ভেতর দিয়ে সে আমার দিকে তেমনি ভাবে চেয়ে আছে; যেন নীরব ভাষায় বলতে চাচ্ছে—'আমি নির্দ্দোষ—ওগো আমি নিরপরাধ!'"

আবার সে নীরব হইল। আমি চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মধ্য দিয়া সত্যই যেন দুইটী ডাগর ডাগর কালো চোখ আমাদের দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতে চাহিতেছিল,—"আমি নির্দ্দোষ—ওগো আমি নিরপরাধ!"

শিশুর জয়।

[১]

"চলে যাও আমার সামনে থেকে, তোমার মুখ দর্শন ক'রতে চাই না।"

"কি অপরাধ করেছি আমি ?"

"ফের কথা কচ্ছিস ? আমার মুখের ওপর জবাব ? যা ব'লছি, তোকে ত্যাজ্যপুত্তুর ক'রলুম।"

পিতার কথা শুনিয়া সুধাংশু নত মস্তকে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সুধাংশুর পিতা নৃপেন্দ্রনাথ ডাকিলেন,—"বৌমা ?"

প্রত্যুত্তরে একটী লাবণ্যময়ী ষোড়শী যুবতী আসিয়া বলিল,—"ডাকছিলেন বাবা ?"

"হ্যাঁ মা, ব'লছিলুম সেই লক্ষীছাড়াটা এইমাত্র এসেছিল। বল্লে, বউ নিয়ে এখানে থাকবে—কি স্পর্দ্ধা ! আমি তাকে বেশ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি,—আর আজ থেকে আমি তাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করেছি, এক কাণা কড়িও সে আমার কাছ থেকে পাবে না।"

যুবতীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সারা ঘরটা হঠাৎ যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। নৃপেন্দ্রনাথের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, বিস্ফারিত নেত্রে তিনি অনিলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনিলা আপনার এই ব্যর্থ চেষ্টায় নিতান্ত লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া নতমস্তকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের

দ্বারা সানের মেঝে খুঁড়িবার বিফল চেষ্টা করিতে লাগিল। যুবতী মুখে কোন কথা প্রকাশ না করিলেও নৃপেন্দ্রনাথ তাহার অন্তরের ব্যথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

ধীরে ধীরে তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি মা, আমার লক্ষ টাকার জমিদারী তোমায় দিয়ে যাব। রাজার হালে তোমার দিন কেটে যাবে।"

অনিলা তেমনিভাবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল,—কোন কথা কহিল না।

বৃদ্ধ নৃপেন্দ্রনাথ জানালার ভিতর দিয়া অনন্ত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তাঁহার চিন্তাও বুঝি আজ আকাশের মতই অনন্ত!

কতক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া অনিলা ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল,—"বাবা!"

"কি মা!"—নৃপেন্দ্রনাথের অনন্ত চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িয়া গেল। বধূর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন,—"কি মা?"

"তিনিও আপনারই ছেলে—যতই দোষ করুন না কেন……"

"না মা, কোন কথা আমায় বোল না, কোন অনুরোধ ক'র না,—আমার মতের পরিবর্ত্তন হবে না। সে আমার ছেলে,—হ্যাঁ, একদিন ছিল বটে; কিন্তু এখন আর নেই। সে,—আমার ছেলে—আমার সুধাংশু ম'রেছে,—আমার ছেলে নেই, কখনও ছিল না মনে ক'রব……"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল। অনিলারও নেত্রপল্লব

সিক্ত হইয়া উঠিল। অশ্রু-গোপন-মানসে ধীরে ধীরে সে কক্ষের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াও মা, আর একটা কথা, আজ থেকে আর কোন দিন আমার সাম্‌নে তার নাম অবধি মুখে আনবে না—তার সঙ্গে তোমার সকল সম্বন্ধ শেষ হ'য়েছে। কোন অনুরোধ আমায় ক'র না—এই আমার আদেশ জানবে।"

ধীরে ধীরে অনিলা কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁধ ভাঙ্গা নদীর স্রোতের ন্যায় আঁখির রুদ্ধ কবাট খুলিয়া অজস্রধারে অশ্রু তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিতে লাগিল।

ধীরপদে আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অনিলা গা ঢালিয়া দিল—শ্রান্তিতে তাহার সারা দেহখানি অবশ হইয়া গিয়াছিল!

লক্ষ টাকার জমিদারীর মালিক সে, কিন্তু তাহাতে কি? হায় তুচ্ছ অর্থ! সে সারা জীবনের জন্য স্বামী-সুখে বঞ্চিতা হইল! কি সামান্য এ পৃথিবী—কি নগণ্য তাহার অর্থ-সম্পদ!

সেই একদিন, যখন সে দুই বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহারা হইয়া নৃপেন্দ্রনাথের সংসারে আসে, সেদিন ত' এমন ছিল না! তবে আজ এ কি ভাগ্য বিপর্যয়?—যেখানে সে কর্তৃত্ব করিয়া রাজ-রাণীর সুখ উপভোগ করিবে, আজ সেখানে রাজরাণী হইয়াও প্রাণে এ ব্যাকুলতা, এ বিপুল অশান্তি কেন?

নৃপেন্দ্রনাথের সহিত তাহার পিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, সেই জন্যই তাঁহার মৃত্যুর পর নৃপেন্দ্রনাথ অনিলাকে আপনার সংসারে

আনিয়া রাখেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বন্ধুর যদি কোন কন্যা হয় তবে তাহার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়া বাল্যের বন্ধুত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর করিবেন। অনিলার পিতা অকালে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, নৃপেন্দ্রনাথ তখন তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে তাঁহার অনাথা কন্যাকে পিতা মাতার অভাব অনুভব করিতে দিবেন না এবং বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহারই সহিত সুধাংশুর বিবাহ দিবেন। নৃপেন্দ্রনাথ ছাড়া একথা আর কেহই জানিত না। অনিলা যখন নৃপেন্দ্রের সংসারে আসিল, সুধাংশুর বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের প্রতি উভয়ের স্নেহ দৃঢ়তর হইতে লাগিল,—ভগ্নিকে ভ্রাতা যেমন স্নেহ করে অনিলাকে সুধাংশু তেমনি স্নেহ করিত। সে কোন দিন মনেও করে নাই যে এই বাল্য-সঙ্গিনীকে একদিন জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে!

তাহার পর সে যখন বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বি-এ পাশ করিল, তখন একদিন অতর্কিতে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। আপত্তি করিবার সময় ও সুযোগ সুধাংশু কিছুই পাইল না। আপত্তি করিতে না পাইলেও এ বিবাহটা সে মোটেই বিবাহ বলিয়া মনে করিল না। অনিলাকে একদিনের জন্য পত্নী বলিয়া স্বীকার করিল না। পাছে বাড়ীতে থাকিলে পিতা তাহার ব্যবহারের কথা জানিতে পারেন, এই ভয়ে এম-এ পড়িবার অছিলায় সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

অনিলাও প্রথমটা এই বিবাহ-ব্যাপারে বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া

পড়িয়াছিল,—চিরদিন যাহাকে দাদা বলিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকে স্বামী বলিবে কি করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সে বুঝুক আর নাই বুঝুক, রমণী সে,—একবার যাহাকে বিবাহ করিয়াছে, আজীবন তাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। জীবনের একমুহূর্ত্তের অনবধানতায় যে ভুল হইয়া গিয়াছে সারা জীবন তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া যৌবন তাহার হৃদয়ে নারীত্বটুকু ফুটাইয়া তুলিতেছিল, একটু একটু করিয়া সে আপনার হৃদয়ের শূন্যতা উপলব্ধি করিতেছিল, একটু একটু করিয়া তাহার প্রাণে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিতেছিল, একটু একটু করিয়া সে প্রেমের অর্থ উপলব্ধি করিতেছিল, কিন্তু পূর্ণতা কই, তৃপ্তি কই? সে বুঝিত না, কেন এ ব্যাকুলতা!

[২]

কলিকাতায় আসিয়া সুধাংশু অনেক কথা ভাবিল কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কেমন করিয়া এই বাল্য-সঙ্গিনী ভগ্নিরূপিনী অনিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবে? একদিনের কথা তাহার মনে পড়িল, দুইজনে তাহারা তখন পুকুর ধারে খেলা করিতেছিল। সুধাংশু বলিল,—"আয় না অনি, আমরা বর-বউ খেলি।" কথাটা শুনিয়া বালিকা অনিলা লজ্জিত ভাবে বলিল,—"না ভাই ছিঃ! তুমি যে দাদা। ভাই ব'নে বুঝি বর-বউ খেলে?"

—সেই অনিলা আজ সত্যই আমার পত্নী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সেই বা কি মনে করিতেছে, কে জানে?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, একটা কিছু উপায় করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই সে পিতার অজ্ঞাতে এক দরিদ্রা সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সকল গোলের নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিল।

কথাটা কিন্তু গোপন রহিল না। অতর্কিতে বজ্রাঘাতের মত আসিয়া সেটা একই সঙ্গে নৃপেন্দ্র নাথ ও অনিলার বক্ষ-পঞ্জর চূর্ণ করিয়া দিয়া গেল। ইহার কয়েক দিন পরে নৃপেন্দ্রনাথ সুধাংশুর একখানি পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখাছিল,—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়। কলিকাতা ৩০শে ফাল্গুন।

প্রণাম শতকোটী নিবেদন মিদং,—আপনি আমার সহিত অনিলার বিবাহ দিবার কথা একদিন আভাষেও আমায় জানান নাই,—ইহাতে আমাদের দুই জনের জীবন যেরূপ ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার শক্তি নাই। বাল্যের মধুর সাহচর্য্যে যাহার সহিত একত্রে বাড়িয়া উঠিয়াছি, চিরদিন যাহাকে ভগ্নির মত ভাল বাসিয়াছি ও স্নেহ করিয়াছি, কৈশোরে যাহাকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়াছি, লেখাপড়া শিখাইয়াছি তাহাকে আজ আমি পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম,—জীবনে কোনদিন পারিব বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে যদি কোনদিন কথাটা আভাষেও

আমার নিকট প্রকাশ পাইত, তবে বেচারী অনিলার সারা জীবনটা এমন ভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইত না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনিলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা অসাধ্য—যাহাতে এ দুর্ম্মতি মনে একদিনও স্থান না পায়, এই জন্যই আমি কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা বালা দেবীকে বিবাহ করিয়াছি। আশাকরি পুত্রের এ অবাধ্যতা ও অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনি কোন মতেই এ বিবাহে মত দিবেন না বুঝিয়াই কথাটা পূর্ব্বে আপনাকে জানাই নাই।

আমার শারীরিক কুশল জানিবেন। শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। আপনার কুশল দানে সুখী করিবেন। ইতি।

সেবক—শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

পত্র পাঠ করিয়া নৃপেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর যখন তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি পত্রখানি লইয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনিলা তখন ঘরের মেজেয় বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিল,—

"লক্ষ্মণের মুখে শুনি এ দারুণ কথা,
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে সীতা স্বর্ণলতা।
ক্ষণেক কালের তরে চেতনা লভিয়া,
কহিতে লাগিলা দুখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,—
'লক্ষ্মণ! বিধাতা মোর এ দেহ নিশ্চয়,
গড়িলা ভুঞ্জিতে দুঃখ, অন্য কিছু নয়।'"

ঠিক সেই সময়ে নৃপেন্দ্রনাথ পত্রখানা বধূর নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"পড় !"

শ্বশুর চলিয়া যাইতেই পত্রখানা তুলিয়া লইয়া অনিলা পড়িতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহার মনে একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল, প্রথম ছত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ লজ্জার সহিত সে কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু যতই সে পত্রের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল ততই তাহার সে কৌতূহল মিটিয়া গিয়া কি একটা অজানা ভয়ে অন্তর পুরিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে সে যখন প্রমীলার সহিত সুধাংশুর বিবাহের কথা পাঠ করিল, তখন তাহার চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গেল, শেষ অবধি আর পড়িতে পারিল না।

অপমান, ঘৃণা ও মর্ম্মবেদনায় পত্রখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রাণের সমস্ত সাধ, ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা যে, ভগবান এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া দিবেন তাহা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই। আজ তাহার প্রাণে এক অশান্তির দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে সদ্যঃপঠিত রামায়ণের অভাগিনী সীতার কথা তাহার মনে পড়িল ;—সে বুঝিতে পারিল কি মর্ম্মান্তিক প্রাণের জ্বালায় সীতা বলিয়াছিলেন,—

"লক্ষ্মণ, বিধাতা মোর এ দেহ নিশ্চয়,
গড়িলা ভুঞ্জিতে দুঃখ, অন্য কিছু নয়।"

[৩]

একটী একটী করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। সুধাংশু প্রতিদিনই মনে করিতেছিল, পিতার নিকট হইতে আজ নিশ্চয়ই পত্রোত্তর পাইবে ;—কুহকিনী আশা নিত্যই তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিয়া যাইত,—"আজ চিঠি নিশ্চয় আসবে, আর ক্ষমাও তিনি ক'রবেন তোমায়।" কিন্তু ডাক আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যখন সে কিছুই পাইত না তখন হতাশায় তাহার সারাপ্রাণ খানি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। এমনি করিয়া পূর্ণ একমাস কাটিয়া গেল কিন্তু কোন উত্তর সে পাইল না। ক্রমে টাকা আসিবার সময়ও কাটিয়া গেল, পিতা টাকা পাঠাইলেন না। সুধাংশু বড়ই বিপদে পড়িল; বাড়িভাড়া, কলেজের মাহিনা প্রভৃতির জন্য বারম্বার তাগিদ আসিতে লাগিল কিন্তু টাকা কই ?

নিরুপায় হইয়া সুধাংশু দেশে যাইবে স্থির করিল। কিন্তু পিতার নিকট আসিয়া সে যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া গেল, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পথে আসিয়া সে ভাবিতে লাগিল,—অমন স্নেহময় পিতা আমার এই কয়দিনে কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন ? সেই বাল্যে মাতৃহারা হইয়াছি কিন্তু পিতার স্নেহ-যত্নে একদিনের জন্যও ত' কই তাঁর অভাব অনুভব করি নাই,—আর সেই পিতা আজ কিনা এমনি পাষাণ হৃদয়ে আমায় প্রত্যাখ্যান করিলেন। কি এমন অপরাধ করিয়াছি আমি, যাহার জন্য আজ তিনি আমায় এমন করিয়া অপমান

করিলেন,—প্রত্যাখ্যান করিলেন? যদিই কিছু অপরাধ করিয়া থাকি তবে কি তাহার ক্ষমা নাই? পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য আছে, কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার কি কোন কর্ত্তব্য নাই?

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল কিন্তু কি করিয়া যে দেনা মিটাইবে, কি করিয়া জীবন যাপন করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া সে মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া চাকুরীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

বহু অনুসন্ধানের পর সে একটা পল্লীগ্রামের স্কুলে শিক্ষকের পদ পাইল। গ্রামটী তাহার বাটীর নিকটেই। এই স্থানে সে প্রমীলাকে আনিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে লাগিল।

* * * *

মানব যখন বড় স্নেহের বস্তু হারাইয়া ফেলে তখন সে তাহার প্রাণের সেই শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য আর একটা কিছু আঁকড়িয়া ধরিতে যায়। নৃপেন্দ্রনাথের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ হইয়াছিল। নৃপেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই দলের মানুষ যাহারা আপনার জিদের মন্দিরে জীবনের প্রিয়তম বস্তুও বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। তিনি যখন সুধাংশুকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন তখন ক্রোধের বশেই তেমন কঠিন-হৃদয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; ক্রোধের আগুন ক্রমে যখন সময়ের বাতাসে নিভিয়া গেল, তখন সুধাংশুর জন্য তাঁহার সারা প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল,—কিন্তু সে হাহাকার, সে শোকাগ্নি তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না, জিদের কাছে

তাহাকে টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। মনকে সান্ত্বনা দিলেন,—অকৃতজ্ঞ সন্তান সে, কুপুত্র সে, তাই পিতার কার্য্যের সমালোচনা করিতে আসে, পিতার কথা অগ্রাহ্য করে! আর শুধু তাহারই জন্য যে অনিলার সারা জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গেল, সেদিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না! এই ভাবে মনকে বুঝাইয়া তিনি জমিদারীর কার্য্যে মন দিলেন।

কষ্ট বাড়িল অনিলার। চিরদিন সে নৃপেন্দ্রনাথকে পিতার ন্যায় দেখিয়াছে,—পুত্রী পিতার নিকট যেমন আদর-আব্দার করে, চিরদিন সে তেমনি করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন তিনি সর্ব্বদা জমিদারীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার নিকট বসিয়া দুইদণ্ড কথা কহিবার সুযোগ সে পাইত না। বাড়িতে চাকর-দাসী ছাড়া আর কোন আত্মীয় ছিল না। কাহারও সহিত দুইটা কথা কহিয়া সে যে দুইদণ্ড সময় কাটাইবে বা প্রাণের মধ্যে একটু স্বস্তি পাইবে এমন সঙ্গি তাহার একটীও ছিল না। নৃপেন্দ্রনাথও ইদানীং তাহার সহিত অধিক কথা কহিতে পারিতেন না, তাহার কারণ তাহাকে দেখিলেই তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাহার ভবিষ্যৎ চিত্র জাগিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখে, অনুতাপে তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। পাছে সে সহানুভূতির অশ্রু দেখিতে পাইলে বালিকার ধৈর্য্যের বন্ধন টুটিয়া যায়, এই ভয়ে চকিতে তিনি সরিয়া যাইতেন। অনিলা মনে করিত, সকলি বুঝি তাহার ভাগ্যের দোষ;—অভাগিনী সে, প্রথম পৃথিবীতে আসিয়াই মাতাপিতাকে হারাইল; তাহার পর যদি বা ভগবান দয়া করিয়া

তাহাকে একটা আশ্রয় দিলেন, তবে সেখানেও তাহারই জন্য মনোমালিন্য ও অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

[৪]

ইহার পর ধীরে ধীরে সুখ দুঃখের মধ্যদিয়া দীর্ঘ পাঁচটা বৎসর কাটিয়া গেল। স্কুলের সামান্য বেতনে ও প্রমীলার সাহচর্য্যে সুধাংশুর দিনগুলা একরকম ভালই কাটিতেছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার একটী পুত্র হইয়াছিল; অবসর কালটা তাহার সহিত বেশ সুখেই কাটিয়া যাইত।

কিন্তু সুধাংশুর এ সুখটুকুও সহ্য হইল না; হঠাৎ বেচারা তিন দিনের জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিল। প্রমীলার সংসারে আপন বলিতে আর কেহই ছিল না; শিশু পুত্রকে লইয়া একাকী অবলা রমণী কি করিয়া যে দিন কাটাইবে বুঝিতে পারিল না। কেবল তাহার উভয় গণ্ড দিয়া অশ্রুর বন্যা ছুটিতে লাগিল।

প্রমীলার এই সর্ব্বনাশ হইবার তিন দিন পরে হঠাৎ সেদিন দ্বিপ্রহরে তাহার বাটীর সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমীলা বুঝিতে পারিল না, এ আগন্তুক সম্ভবতঃ কে হইতে পারে।

ধীরে ধীরে একটী শুভ্রবসনা সুন্দরী আসিয়া তাহার কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল, দৃষ্টি তাহার প্রমীলার উপর ছিল না, তাহার ক্রোড়স্থ শিশুকেই সে একদৃষ্টে দেখিতেছিল। আর বিস্ময়-মূক প্রমীলা দেখিতেছিল, সেই শুভ্রবসনা সুন্দরীকে।

কতক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া প্রমীলা বলিল,—"তুমি—আপনি ?"

রমণীর যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। সদ্যোত্থিতার ন্যায় সে একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—"বোন্, আমার পরিচয় চাচ্ছ ? কিন্তু কি ব'লে পরিচয় দেব, আজ যে আমরা দুজনেই সমান হতভাগিনী"—

তাহার কথায় বাধা দিয়া প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারই নাম অনিলা ?"

মস্তক আন্দোলন করিয়া সে কথায় সম্মতি জানাইয়া অনিলা ব্যাকুল আগ্রহে শিশুকে আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

প্রমীলা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল,—"দিদি !"

প্রত্যুত্তরে অনিলা বলিল,—"বোন্ !" তখন উভয়ের চক্ষেই বান ডাকিল। কেহ আর কিছু বলিতে পারিল না।

রমণী-সুলভ সহিষ্ণুতায় অনিলা এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আপনার বুকের আগুন বুকের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য একটা স্ফুলিঙ্গও বাহির হইতে দেয় নাই। কিন্তু সে যখন শুনিল, সুধাংশু শিশু পুত্র ও পত্নীর মমতা কাটাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছে তখন আর সে কিছুতেই মনকে স্থির করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার স্বামীর পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার ব্যর্থ নারী জন্ম ধন্য করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নৃপেন্দ্রনাথকে কোন কথা জানাইলে পাছে তিনি তাহাকে সে

কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন, এই ভয়ে গোপনে দ্বিপ্রহর কালে সে প্রমীলার নিকট আসিয়াছিল।

* * * * * *

বৈকালে একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া নৃপেন্দ্রনাথ শূন্য মনে তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন; এরূপ সময়ে অনিলা শিশু ক্রোড়ে আসিয়া বলিল,—"গোপী,তোমার দাদুকে নম করত' বাবা!"

চমকিয়া নৃপেন্দ্রনাথ তাহার দিকে চাহিলেন। শিশু তখন মহানন্দে আপন মনে আপনার মুখের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া কি এক অমৃতের আস্বাদ পাইতে প্রয়াস পাইতেছিল, দুই কস দিয়া দরদরধারে লালা পড়িতেছিল।

নৃপেন্দ্রনাথ শিশুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। চিরপরিচিতের ন্যায় এক মুখ হাসিয়া শিশু তাঁহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন,—"অনি! আজ তুমি আমার কথার অবাধ্য হ'য়েছ; জান, শুধু এই দোষে একজনকে আমি কি শাস্তি দিয়েছি?"

নত মস্তকে দৃঢ় স্বরে অনিলা বলিল,—"জানি"

"তোমাকেও সেই শাস্তি দিলুম জানবে।"

অনিলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। এরূপ একটা কিছু যে হইবেই তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত।

* * * * * *

প্রাতঃকালে শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতে নৃপেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত

ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। ঝিনুক লইয়া গেলেই সে তাহা পদাঘাতে ফেলিয়া দিতেছিল এবং দুই হাতে নৃপেন্দ্রনাথের বক্ষের লোমগুলি আকর্ষণ করিতেছিল।

ঠিক এই সময়ে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার নেত্র পল্লব অশ্রুসিক্ত! শিশু তাহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল,—"দাদু, মা দাব, মা দাব!"

রমণী ঈষৎ চেষ্টা করিয়া বলিল,—"আমি আপনার পুত্রবধূ, স্বামী থাকতে কোন দিন আপনার কাছে কিছু চাইনি। আজ অনাথা আমি,আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আমার শিশু,আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে দিদিকে আগের মত আপনার ঘরে স্থান দিন, ভাগ্য বিতাড়িতা আমি যেমন ক'রে হ'ক পুত্র প্রতিপালন ক'রব।"

শিশুকে ছাড়িতে তাঁহার বক্ষ পঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এত মমতা এই একদিনে কেমন করিয়া জাগিয়া উঠিল, তাহা তিনি মোটেই বুঝিতে পারিলেন না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"তার আর দরকার নেই মা; একবার আত্মাভিমানের বশে পুত্র হারিয়েছি—একটী অবলার সারাজীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি, আজ আর আমি আমার পুত্রের এই শেষ স্মৃতিটুকু মুছে ফেলতে পারব না। যা করেছি তার সাজা ভগবান যথেষ্ঠ দিয়েছেন, আর দেবেনও; আর সে বোঝা বাড়াতে চাই না। তোমরা দু'জনে এ সংসার বুঝে পড়ে নাও—আর গোপীর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের এ ছেলেটীকেও একটু দেখো!" বৃদ্ধের দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অভাগিনী।

[১]

যোতীন ঘোষ যেদিন বিনোদিনীর হাতের লোহা ও সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া দিয়া জন্মের মত পৃথিবী হইতে বিদায় লইল, বিনোদিনী সেদিন পাঁচ বৎসরের শিশু-পুত্র জীবনকে লইয়া একেবারে পথে দাঁড়াইল। কাল কি খাইবে সে সংস্থান তাহার ছিল না।

পাড়া প্রতিবেশীর সহানুভূতি ও অনুগ্রহে কোনরূপে মৃত স্বামীর সৎকার করিয়া, জীবনকে বুকে চাপিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমে গন্তব্য স্থান সে মোটেই স্থির করিতে পারিল না, শোকে দুঃখে ও দারুণ চিন্তার আগুনে তাহার সারা প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছিল, কর্ত্তব্য চিন্তার অবসর মোটেই ছিল না।

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের দারুণ রৌদ্র মাথায় করিয়া ছেলে কোলে বিনোদিনী গ্রামাপথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। শ্রান্তি ও অবসাদে, দুঃখ ও চিন্তার ভারে তাহার সারা দেহটা ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তাহার কোথায় ?

জীবন মাতার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ; বালক সে, তাহাদের এই সর্ব্বনাশের কোন কথাই তাহার উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য ছিল না। সে দেখিত মাতা কাঁদিতেছে, বালক তাহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া আপনিও সে ক্রন্দনে যোগ

দিত ;—পরিবর্ত্তনের মধ্যে মাত্র এইটুকুই সে এই কয়দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল।

রৌদ্রের দারুণ উত্তাপে বালকের সারা অঙ্গ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কতক্ষণ পরে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; আধ আধ স্বরে সে বলিল,—"মা ক্ষিদে পেয়েছে।"

বালকের কণ্ঠস্বরে রমণীর চমক ভাঙ্গিল ;—"তাই ত' একটা কোথাও যেতে হবে ত'! নইলে বাছাকে আমার খেতে দেব কি ? বেলাও যে অনেক হ'য়ে গেছে দেখছি!"

বালকের মাথার উপর হাত রাখিয়া বিনোদিনী বলিল,— "আর একটু ঘুমোও বাবা, খাবার আমি তৈরী ক'রছি।" বালক মাতার কথায় দ্বিতীয়বার নিদ্রা যাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল ; মাতা ততক্ষণে গন্তব্য স্থান নির্ণয়ে ব্যস্ত হইল।

হঠাৎ তাহার ভগ্নি দামিনীর কথা মনে পড়িল। আর এক খানা গ্রাম পার হইতে পারিলেই সেখানে পৌছান যাইবে।

সে এইবার দামিনীর গৃহের উদ্দেশেই চলিল।

দামিনী ছিল বিনোদিনীর জেঠতুত বোন। পাথুরে কয়লার মত উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার স্থূল দেহের উপর মন্দ মানাইত না। সংসারে তাহার ফেলা ছড়ার মত না থাকিলেও দুইবেলা দুই মুঠা মোটা ভাত কাপড়ের মত আয় যথেষ্ট ছিল। দুইটী পুত্র এবং একটী কন্যা তাহার স্বচ্ছল সংসারটীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। দয়া বলিয়া জিনিষটা দামিনীর হৃদয়ে খুব অল্পই ছিল ; তবে খরচের বেলা সে চিরদিনই মুক্ত হস্ত ; এক পয়সার জিনিষ তিন

পয়সা দিয়া লইতে কোন দিনই সে কাতর হইত না। স্বামীটী তাহার মেষ-শাবকের মতই নিরীহ এবং বর্ণ পরিচয়ের গোপালের মতই সুবোধ পুরুষ।

এ হেন ভগ্নির গৃহ-প্রাঙ্গণে বিনোদিনী যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বেলা প্রায় তিনটা।

দামিনী দাওয়ার উপর বসিয়া রাত্রের রন্ধনের জন্য আলু কুটিতেছিল; বিনোদিনীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আপনার স্বভাব-কঠোর মুখখানার ভাব আরও একটু কঠিন করিয়া বলিল,—"কিলো বিনি যে? কি মনে ক'রে?"

বিনোদিনীর সে কথাটা মোটেই কাণে গেল না। আত্মীয়া সন্দর্শনে স্বামীর শোকটা আজ আবার নূতন করিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো, তুমি কোথায় গেলে গো, আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রে গেলে গো!"

কে যে তাহার কি সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে তাহা বিনোদিনীর আকার প্রকার এবং পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া দামিনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ভগ্নির প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহ দেখাইবার জন্য সেও সে ক্রন্দনে যোগ দিল। পার্শ্বেই তাহার শিশু পুত্র খেলিয়া বেড়াইতেছিল, অকস্মাৎ সে জননীকে কাঁদিতে দেখিয়া আপনিও সে সুরে সুর মিলাইয়া দিল। বিনোদিনীর পুত্রও সদ্য নিদ্রাভঙ্গে ও ক্ষুধার তাড়নায় এই ক্রন্দনে যোগ দিয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দনের বেগ দ্রুততর বেগে বহিয়া ক্রমে তাহা

মন্দীভূত হইয়া আসিল। দামিনীই প্রথমে এই দুর্জ্জয় শোকের বেগ সম্বরণ করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"তা' হ্যাঁলা বিনি, এ সর্ব্বনাশ হ'ল কবে?"

"আজ দশ দিন দিদি!"

"তবে এখনও ওসুধ যায় নি? তা ভিটে ছেড়ে এখন চলে এলি যে?"

"কি আছে দিদি ভিটেয় যে, সেখানে পড়ে থাকব? ঘরের চাল বেচে তবে কর্ত্তার সৎকার......" সে আর বলিতে পারিল না, অজস্র অশ্রুর ধারায় তাহার দুই গণ্ড পরিপ্লাবিত হইয়া গেল।

দামিনী বুঝিল তাহার ভগ্নি সপুত্র তাহারই অন্ন ধ্বংস করিতে আসিয়াছে; প্রাণটা তাহার একবার মাথা নাড়া দিয়া বলিল,—"ওসব হবে-টবে না।" কিন্তু কথাটা বিনোদিনীকে এখন বলা যায় না;—চামারের প্রাণেও এটুকু দয়া থাকে! দামিনী মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল,—"আচ্ছা এত তাড়াতাড়ি কি? দুদিন যাকই না, তখন পথ দেখতে বল্লেই হবে।"

মনের ভাবটা গোপন করিয়া দামিনী বলিল,—"তা হ্যাঁলো, তার হয়েছিল কি?"

"জ্বর দিদি! আজ ছ'মাস শয্যাশায়ী, কি কষ্টে যে এই ছ'মাস কাটিয়েছি দিদি তা আমিই জানি, আর সেই মধুসূদনই জানেন, অর্দ্ধেক দিন উপোস করেই কেটেছে; তবু যে আমি বাছাকে দু'বেলা দু'মু'ঠো খেতে দিতে পেরেছি সে শুধু সেই মধুসূদনেরই

কৃপায়।” সঙ্গে সঙ্গে তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি সাফল্যের একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পূরিয়া গেল।

“তা অমন দৈনিদশা তোদের হ’ল কেন?”

“কবেই বা স্বচ্ছল ছিল দিদি যে আজ নতুন ক’রে দৈনিদশা দেখছ? কর্ত্তা যখন ভাল ছিল তখন মজুরী করে যা’ রোজকার ক’রত, দু’বেলা দু’মুঠো খেয়ে তার কিই বা বাকি থাকত দিদি? তারপর এদানী আবার কর্ত্তা গাঁজা ধরে ছিল, দু’বেলা দু’মুঠো পেটপুরে খেতেই পেতুম না তা জমাব কি?”

“অঃ! শেষে আবার এত গুণ হ’য়েছিল বুঝি? তা ভাল! গরীবের এ ঘোড়া রোগ কেন?”

এই সময় জীবন বিনোদিনীকে বলিল,—“মা খেতে দে’না, বড় ক্ষিদে পেয়েছে যে!”

দামিনী সহানুভূতি জানাইয়া প্রশ্ন করিল,—“হ্যাঁলো বিনি, তোদের আজ খাওয়া হয়নি বুঝি?”

অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে দিদির দিকে চাহিয়া বিনোদিনী বলিল,—“না দিদি, সারাদিনটা পথেই কেটেছে। আর আছেই বা কি যে খাব? সবই ত’ পেটে পুরেছি।

“ওমা, একথা এতক্ষণ ব’লতে হয়! যা এখন পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে আয়গে, আমি রান্নার সব যোগাড় করে রাখছি।”

বিনোদিনী পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

[২]

তাহার পর দীর্ঘ তিনটী মাস কাটিয়া গিয়াছে। বিনোদিনী এই তিন মাস দামিনীর গৃহেই রহিয়াছে। এই কয়দিনেই সে দিদির স্বভাব ও স্নেহের গভীরতা পরিমাণ করিয়া লইয়াছিল কিন্তু তাহার বলিবার মুখ কই? অনাথা যে, পরের দয়ায় ও শ্রদ্ধার দানে যাহাকে জীবনধারণ করিতে হইবে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার শক্তি ও সামর্থ্য তাহার কোথায়?

দিদির শত অত্যাচার, শত অবহেলা সে মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইত; দামিনীর কথায় উত্তর দিতে কোন দিনই সে সাহস করিত না;—ইহার একটা কারণও ছিল। যখনই বিনোদিনী জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন অপরাধ করিত, দামিনী তখন মুর্ত্তিমতী ধূমাবতীর মত তাহাকে তাড়না করিয়া আসিত; কিন্তু সে যখন দেখিত বিনী পোড়ারমুখী সব কথাই নীরবে সহিয়া যায়, তখন দ্বিতীয়বার অপরাধ হইলে সে যে আর তাহাদের রাক্ষসের আহার যোগাইতে পারিবে না সেকথা স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিয়া এই এক পক্ষীয় যুদ্ধের উপসংহার করিয়া ফেলিত।

সেদিন দ্বাদশী। বিনোদিনী একাদশীর দিন নির্জ্জলা উপবাস করিত। তাহার উপর নিত্যকার মত সেদিনও তাহাকে সংসারের তাবৎ কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। রাত্রে সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া সে যখন শয্যা গ্রহণ করিল তখন পাখাটা নাড়িয়া যে আলোটা নিভাইয়া দিবে সে সামর্থ্যটুকুও তাহার ছিল না;—শরীর তাহার

ক্লান্তিতে এতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই পরদিনেও তাহার উঠিতে বিলম্ব হইয়া গেল।

কাঁসার মত কর্কশ কণ্ঠে দামিনী তাহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ডাকিল,—"ও বিনি, বিনি! বলি নবাবের মাগ নবাব, বেলা বারোটা হোতে গেল আজ কি আর ওঠবার ফুরসৎ হচ্ছে না?"

তাহার সেই মিহিগলার মিঠা আওয়াজটাও যখন ক্লান্তা বিনির নিদ্রাতুর প্রাণকে জাগাইয়া তুলিতে পারিল না, সে তখন রাগ করিয়া আপনিই রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল।

রাগের জ্বালায় এবং দীর্ঘ তিন মাসের অনভ্যাস বশতঃ সেদিন সে ভাতটা ধরাইয়া ফেলিল; চড়চড়িটা পুড়িয়া গেল, মাছের তরকারীতে নুন দিতে একেবারেই ভুলিয়া গেল এবং কলাইয়ের ডালে তুইটা তরকারীর নুন ঢালিয়া ফেলিল।

বেলা প্রায় সাড়ে সাতটার সময় বিনোদিনী উঠিয়া আসিয়া দেখিল দিদি আজ স্বয়ং রন্ধন করিতেছেন! তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সে রন্ধন করিবার জন্য আসিল।

"দাও দিদি, আমি রাঁধছি।"

"থাক গো বড় লোকের গিন্নি! অনেক হ'য়েছে!" বলিয়া দামিনী মুখ ফিরাইয়া আপনার মনেই রাঁধিতে লাগিল। বিনির দিকে একবারও ফিরিয়াও চাহিল না।

উপবাসক্লিষ্ট বিনি দ্বারের নিকট বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যখন দেখিল দিদির রাগ পড়িবার কোন সম্ভাবনাই

এখন নাই, তখন সে অপরাধিনীর মত ধীরে ধীরে আবার ডাকিল,—"দিদি...!"

দলিতাফণিণীর মত সবটুকু বিষ উগ্‌রাইয়া দিয়া দামিনী গর্জ্জিয়া উঠিল,—"হ্যা দেখ বিনি, মিছিমিছি বকাসনি ব'লছি; একে আগুণের তাতে মাথার ঠিক নেই তার ওপর আবার ওঁর কাঁদুনি শোন! এত সাধ্যি আমার নেই। কি, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা ব'লছি এখান থেকে।"

একটা বুক ভাঙা তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বিনোদিনী সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে বিনোদিনী আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া জীবনকে বুকে চাপিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ছিল এরূপ সময়ে দামিনী সপদদাপে কক্ষের সম্মুখে আসিয়া ডাকিল—"বিনি!"

বিনোদিনী জীবনকে তাড়াতাড়ি নামাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; দিদির হাবভাব দেখিয়া সে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে, একটা কিছু অনর্থপাত হইয়াছেই।

"হ্যাঁ লা বিনি, এই বাটীর দুধ কি হ'ল?"—দামিনী দুগ্ধের দাগ সমেত একটা বাটী তাহাকে দেখাইল।

"তাত' জানি না দিদি!"

দিদি গর্জ্জিয়া উঠিল,—"জানি না কি রকম? রান্না ঘরে আমার পেছনে বাটী করা এই দুধ ছিল, তুই জানিস না ত' জানে কে বলত? রান্না ঘরে তুই-ই ত' গেছলি, তবে আমি খেয়েছি বল?"

রাগে গর গর করিতে করিতে বিনোদিনীর উপর সমস্ত দোষটা চাপাইয়া দামিনী যখন পিছন ফিরিয়া আপন মনে রন্ধন করিতেছিল, সেই সময় তাহার সখের বিড়াল বিধুমুখী যে ধীর পদ বিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধটুকু নির্ব্বিবাদে শেষ করিয়া গিয়াছিল, তাহা একমাত্র সর্ব্বদর্শী ভগবান ছাড়া জগতের কোন প্রাণীই দেখে নাই।

"তা হ'লে কি ব'লতে চাও দিদি যে, আমিই দুধটা খেয়েছি ?"

"তা খেয়েছ কি না খেয়েছ তা আমি কি ক'রে জানব ?"

"এতদিন তোমার কাছে রয়েছি দিদি, কোন দিন এমন চুরি করে খেয়েছি কি, যে........." বলিতে বলিতে অশ্রুবেগে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

"হ্যা-গ্যাখ বিনি, সকাল বেলা এমন করে মিছি মিছি চোখের জল ফেলিসনি ব'লছি। কাঁদবার কথা এতে কি আছে, কি বলেছি আমি ?"

বিনোদিনী দেখিল কথার উপর যতই কথা বলা হইবে কলহের বেগ ততই বাড়িয়া যাইবে। আর বলিবেই বা সে কি ? এত ছোট যাহার মন, সামান্য একবাটী দুগ্ধ দিয়া যে তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না, বলিবার মত কথা তাহার সহিত কি থাকিতে পারে ? এমন সঙ্কীর্ণ যাহার ব্যবহার, ভগ্নী বলিয়া স্বীকার করা ত' দূরের কথা, মনিব বলিয়াও বিনোদিনী তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিত না ; কেমন একটা বিদ্রোহের ভাব একটা অস্বস্তি আপনিই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। তবে নাকি

ভগবান আজ তাহাকে নিষ্ঠুরভাবেই আহত করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই জন্যই কোন রকমে বুকের আগুণ বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস চেষ্টা করিয়া ধরিয়া রাখিয়া, নীরবে সে দামিনীর গৃহ কার্য্যগুলা করিয়া যাইত। মুখ বুজিয়া থাকিবার আরও একটা কারণ ছিল,—সে তাহার ভাঙা ঘরের একটী মাত্র প্রদীপ জীবন! একা হইলে আজ সে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিদির সংসারের সব কাজ করা সত্ত্বেও মুখনাড়া খাওয়ার অপেক্ষা পরের বাড়ী দাসী-পনা করাও বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে কোন দিন এ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। যাইতে পাবে নাই শুধু জীবনের জন্য।

দিদির অন্যায় তিরস্কারের জন্য যখন প্রাণে সে তীব্র দংশন-যাতনা অনুভব করিত তখন ঘুমন্ত জীবনকে বুকের কাছে আর একটু টানিয়া আনিয়া বুকভাঙা আকুল ক্রন্দনে ভগবানের নিকট শুধু আপনার বুকের ব্যথা নিবেদন করিত; বলিত,—"ভগবান, অভাগীর কপালে যদি এত দুঃখ লিখেছিলে, তবে তার মাঝে মাতৃত্বের এ মধুর সুখটুকু ফুটিয়ে তুলেছিলে কেন দয়াময়?......... আর অভাগীকে যদি দয়া করে ছেলে দিয়েছ, তবে তাকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবার মত শক্তি আমায় দাও নি কেন জগবন্ধু?"

শুধু ক্রন্দন করিয়াই সে সুখ পাইত; তরল-তপ্ত-অশ্রুর ধারা বুঝি গঙ্গার পবিত্র প্রবাহের মতই অন্তর তাহার পূত-পবিত্র-পরিপূর্ণ করিয়া দিত! হায় অভাগিনী!

[৩]

"উঃ, মা গো! মা তুই কোথা?"

"এই যে বাবা—" বলিয়া বিনোদিনী জীবনের নিকট আরও একটু সরিয়া বসিল; তাহার জ্বর-তপ্ত কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি জীবন?"

"বড্ড মা! মাথাটা যেন খসে যাচ্ছে, উঃ!"

বিনোদিনীর স্নেহ-কোমল মাতৃহৃদয় দুর্ভাবনার কৃষ্ণ মেঘে ঢাকিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে জীবনের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। জীবনের সারা গা-টা অগ্নি-তপ্ত লৌহ খণ্ডের মতই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল;—জ্বরের জ্বালায় সে ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতেছিল।

দামিনীর প্রহারের ফলে আজ প্রায় চারি পাঁচ দিন হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল; এ কয়দিন বিনোদিনী সংসারের সমস্ত কর্ম্ম করিয়া তবে রুগ্ন-পুত্রের শয্যাপার্শ্বে দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ পাইত; অদ্য জ্বরের প্রকোপটা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় সে আর পুত্রের শয্যাপার্শ্ব ছাড়িতে পারে নাই; সংসারের কাজ কর্ম্মও করিতে পারে নাই।

দামিনী যখন দেখিল বিনোদিনী সেদিন রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মের কোন উদ্যোগ করিতেছে না, তখন সে নিজেই কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া গেল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল,—"আজ সাধতেও যাব না, খেতেও দেব না; দেখি ওর বদমাইসি সারে কি না! খেয়ে খেয়ে ভারী তেল হ'য়েছে।" দুধ চুরির দিন হইতেই সে

বিনোদিনীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস বিনোদিনী দুধটা নিজে না থাক্ অন্ততঃ ঐ ছেলেটাকে খাওয়াইয়াছে; ছেলেটাই কি কম সয়তান গা! মার, ধর, কুটে ফেল, একবার 'রা'-করে না গা! মহা হারামজাদা ওটা।

মধ্যে মধ্যে রন্ধনশালা হইতে মৎস্য চুরি যাইত, দুগ্ধের কড়া হইতে দুধ চুরি যাইত, বিনোদিনী ইহার কোন কৈফিয়ৎই দিতে পারিত না; দামিনী কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিত যে, চোর আর কেহ নহে, জীবনই চুরি করে:—ছোঁড়া পাজির-পা-ঝাড়া!

যথাসময়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলের আহারাদি হইয়া গেল. বিনোদিনীকে আহারের জন্য সেদিন কেহই ডাকিতে আসিল না; রুগ্ন-পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহারও সেদিন আহারের কথা মনে ছিল না।

দারুণ জ্বরের প্রকোপে জীবন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতেছিল,—"ওগো মাসিমা, সত্যি ব'ল্‌ছি আমি মাছ খাইনি—উঃ—উঃ—মাগো, মরে গেলুম.........না না মাসিমা, তোমার পায়ে পড়ি, আর মের না.........আর কখনও ক'রব না ......না গো আর কখনও ক'রব না......উঃ মা......"

উৎকণ্ঠিতা বিনোদিনী পুত্রের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে বসিয়াছিল। ক্রমে জীবনের অবস্থা দেখিয়া তাহার অত্যন্ত ভয় হইল, ত্রস্তে সে ছুটিয়া দামিনীর ঘরের দিকে গেল। দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিল,—"দিদি!"

দামিনী পুত্রের সহিত কথা কহিতেছিল। বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া নীরব হইল। বিনোদিনী উপর্য্যুপরি কয়েকবার ডাকিলে পর সে আপন মনে তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল,—"আচ্ছা আপদ দেখছি; সারাদিন খেটে-খুটে যে দুপুরবেলা তিলেকের তরেও চোখের দুটো পাতা এক কর্‌ব তারও যো নেই! কি বিপদেই পড়েছি! এমন আপদও মানুষের জোটে গা!"—ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে সে দ্বার খুলিল; বিরক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"হয়েছে কি? এত হাঁকাহাঁকি কচ্ছিলি কেন?"

"জীবন কি রকম ক'রছে দিদি, একবার দেখবে এস।"

"তোর কি সব তাতেই বাড়াবাড়ি বিনি? অসুখ কি আর কারো ছেলের হয় না, শুধু তোর ছেলেরই হ'য়েছে? কই চ'-দেখি, দেখিগে কি হ'য়েছে?"

দামিনী বিনোদিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া জীবনের শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইল। জীবন তখন বিকারের ঝোঁকে বকিতেছিল,—"না না মাসিমা, আর কাজে ফাঁকি দেব না, রোজ ক'রব—রোজ ক'রব, ওগো বাবা গো, আর মের না গো………"

কি জানি কেন দামিনীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িয়া গেল; তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল,—"তাই ত বিনি, জীবনের অসুখটা যে এমন বেঁকে দাঁড়িয়েছে তা ত' কই আমাদের কিছু বলিস নি?"

"দিদি, আমার কি হবে দিদি?"—স্নেহ-ব্যাকুল মাতৃ-হৃদয় তাহার দারুণ আশঙ্কায় পুরিয়া উঠিয়াছিল।

"ক'বরেজ মশাইকে একবার ডাক্‌তে পাঠাই না হয়, দেখি, যদি সন্ধ্যে নাগাৎ নিয়ে আস্‌তে পারে।"

এতদিন শত অশ্রুপ্লাবন যে কঠিন পাষাণকে গলাইতে পারে নাই, আজ কি জানি কোন শুভগ্রহের অনুকূল দৃষ্টিতে তাহাই মাত্র একটী কথায় গলিয়া গেল। জীবন যে তাহারই নিকট অপকর্ম্মের সাজা লইয়া জ্বরে পড়িয়া আজ মরিতে বসিয়াছে, এই ধ্রুব সত্যের আলোকটী এতক্ষণে তাহার নির্দ্দয় হৃদয়ে কোনরূপে একটু পথ করিয়া প্রবেশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহের তন্ত্রী কোন এক অজানা হাতের তীব্র আঘাতে ব্যাকুল করিয়া দিল। আজ এই প্রথম, দামিনী ভগ্নীর দারুণ দুর্ভাগ্যের জন্য আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিল।

দামিনীর চেষ্টা ও যত্নে অবিলম্বে একজন কবিরাজ ডাকিতে গেল।

* * *

দামিনীর প্রেরিত লোক যখন তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল, বিনোদিনীর জীবনের শেষ সম্বল জীবন তখন পাথরের মতই কঠিন ও শীতল হইয়া গিয়াছিল।

পুত্রের শেষ নিঃশ্বাস যখন বায়ুর সহিত মিশাইয়া গেল, তখন বিনোদিনী একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"ভগবান,

নিষ্ঠুর পাষাণ, এ সুখটুকুও তোমার চোখে সইল না ?......উঃ জীবন, বাবা আমার !”

গভীর শোকে তাহার নয়নের অশ্রু জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। উত্তেজনায় তাহার চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার তখনকার অবস্থা দেখিয়া দামিনী শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সে দূরে সরিয়া বসিল।

পরদিন প্রাতঃকালে দামিনী উঠিয়া যখন বিনোদিনীকে ডাকিতে আসিল, তখন দেখিল, সমস্ত দেহটা তাহার নীল হইয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া ফেণা ও লালা বাহির হইয়া অনেকটা স্থান সিক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

এতদিনে অভাগিনী প্রকৃত শান্তি পাইল।

মিলন।

মোগল ও পাঠাণের মধ্যে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মোগল সেবার তিন দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছিল; পাঠাণ সেনা প্রতিদিনই হারিতেছিল।

সন্ধ্যাকাল। মোগল সহকারী-সেনাপতি কুতবখান সাহেব আপনার বস্ত্রাবাসের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন; সারাদিনের সমর শ্রান্তি অপনোদন—ওঃ সে কি আরামদায়ক!

অকস্মাৎ বস্ত্রাবাসের পর্দ্দা সরাইয়া প্রহরী প্রবেশ করিল। কুতব মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে কুর্ণিশ করিয়া বলিল,—"হুজুরালি দুনিয়ার মালেক সাহন্‌সা আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।"

কুতবের মুখে একটু বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে একটু বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন, খোদা বুঝি আজ সেটুকুও তাঁহার অদৃষ্টে লেখেন নাই! কিন্তু আপনার সুখ দেখিতে গেলে চলিবে না—কর্ত্তব্য সকলের উপর। প্রহরীকে বলিলেন,—"বলে দাও এখুনি যাচ্ছি।"

প্রহরী চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই কুতব সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া বহির্গত হইলেন। অল্প দূরেই একটী সুদৃশ্য তাঁবুর মধ্যে স্বয়ং মোগল বাদশা আকবর সাহ বসিয়াছিলেন, কুতব তাঁহাকে কুর্ণিশ

করিয়া দাঁড়াইলেন। বাদসাহ্ ইঙ্গিতে তাঁহাকে একটী আসন দেখাইয়া বসিতে বলিলেন।

বাদসাহ্ প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি খুব ঘোড়ায় চ'ড়তে পারেন, কি বলেন সেনাপতি?"—বলিয়া তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

"জনাব! লোকে ত' তাই বলে।"

"বিপদ আপদে খুব ভয় হয় না ত'?"

"মোগল বাচ্ছা, জনাব, ভয় কাকে বলে জানে না।"

"বেশ, শুনে প্রীত হলুম। একটা বিশেষ জরুরী কাজের জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। এ কাজে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা খুব বেশী!"

"জনাবের মেহেরবাণী!"

"বৈরাম খাঁর কাছে একটা সংবাদ পাঠান বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে—আপনাকে সেই সংবাদ নিয়ে যেতে হ'বে।"

কুর্ণিশ করিয়া কুতব বলিলেন,—"বান্দা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। হুকুম হলেই যাব।"

"পথ জানেন?"

"কতক কতক জানি, যেতে পারব'থণ।"

"ঠিক যেতে পারবেন ত'?"

"নিশ্চয় পারবো জনাব!"

"চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে ষড়যন্ত্র! বিপদ আমাদের বেড়ে রয়েছে; তা ছাড়া দেশের বাসিন্দাদের মোটে বিশ্বাস করা হবে না।"

"জনাব! আমি আমার হাতিয়ার ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস ক'রব না।"

"যদি শত্রু হস্তে বন্দী হন তবে যেন গুপ্ত সংবাদের কাগজপত্র কোন মতে তাদের হাতে প'ড়তে দেবেন না।"

"জান কবুল জনাব, কোন মতেই তা হবে না।"

"যাতে না বিপদে পড়েন সেই চেষ্টাই সর্ব্বপ্রথম ক'রতে হবে।"

"মানুষের যতদূর সাধ্য বান্দা তার ত্রুটী ক'রবে না জনাব!"

"কাগজগুলা বৈরামকে দিয়ে তার কাছ থেকে উত্তর আনতে হবে—কতদিন আন্দাজ লাগবে এতে?"

"চারদিন। চারদিনেও আমি যদি না ফিরি—তা হলে জানবেন বান্দা মরেছে..."

—"কিম্বা বন্দী হয়েছেন?"

"গোস্তাকি মাফ হয় জনাবালি, বন্দী কখনও হব না বলেই আমার বিশ্বাস।"

"বেশ, খুব ভাল কথা। এই দেখুন, এই রাস্তা দিয়ে অপনাকে যেতে হবে—আর এই নিন, এই চিঠিখানা বৈরামকে দেবেন।"

কুর্ণিশ করিয়া কুতব বাহিরে আসিলেন। আজ এই বিপদ-পূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার বীর হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল...হয় মৃত্যু না হয় পদোন্নতি ও রাজ-সম্মান! সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রণয়িনী রোসেনা বিবির কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই বসোরাই গোলাপের মত সুন্দরী সুবেদার কন্যা...সে যে তাঁহারই আশা পথ চাহিয়া আছে; এবার এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সুবেদার

সাহেব নিশ্চয়ই রোসেনাকে তাঁহার করে অর্পণ করিবেন। তাহার উপর যদি আবার আজিকার এই কার্য্যটা সুসম্পন্ন করিয়া তিনি বাদসার অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারেন, তাহা হইলে ত' আর কোন কথাই নাই! বাস্তবিক কুতব সাহেবের খুব জোর অদৃষ্ট, পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি আপন কর্ম্মকুশলতায় দুই হাজারি মনসবদারের পদ হইতে বৈরামের সহকারী পদে উন্নীত হইয়াছেন।

আপনার ভাবী সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর বাদসাহ প্রদত্ত পত্রখানি সাবধানে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময় আপনার তেজস্বী অশ্বকে সুসজ্জিত করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন। উপরে তখনও চন্দ্র হাসিতেছিল এবং ভূপৃষ্ঠে স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল।

মোগল ও পাঠাণের পরিচ্ছদের পার্থক্য অতি সামান্য, সেজন্যই কুতব সাহেব শত্রুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শত্রুসেনা পার হইয়া তিনি গ্রাম ও মাঠ ধরিয়া চলিলেন। কটিতে তাঁহার দীর্ঘ তরবারি লম্বিত, কটিবন্ধে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ও টোটাভরা পিস্তল, হস্তে দীর্ঘ ভল্ল, অপর হস্তে অশ্ব-বল্গা ধারণ করিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। গ্রামগুলি উভয় সেনার আক্রমণে একরূপ জনহীন হইয়া পড়িয়াছিল; যে দুই একজন

লোক ছিল তাহারাও কুতব সাহেবের সৈনিকের পরিচ্ছদ দেখিয়া দূরে পলায়ন করিল।

কুতব সাহেব নির্ব্বিঘ্নেই বৈরাম খানের নিকট সন্দেশ লইয়া উপস্থিত হইলেন। কূট রাজনৈতিক বৈরাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুতব সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"উত্তর নিয়ে যাবে তুমি?"

"তাই ত' হুকুম আছে।"

"বেশ এই নাও, বাদশার কাছে এটা শাগ্‌গির পৌঁছান দরকার, কিন্তু সাবধান শত্রুর হাতে যেন না পড়ে।"

"জান্ কবুল, কিছুতেই তা হ'তে দেব না।"

"বেশ, যাও।"

সামরিক কেতায় সেলাম করিয়া কুতব সাহেব আবার যাত্রা করিলেন। তখন সন্ধ্যা রাত্রি, চাঁদ উঠিয়াছে, দুই পার্শ্বে পাহাড়-গুলা যেন সৌন্দর্য্যের নন্দনে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু কুতবের সে সব দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না, কেমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আকবর সাহের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়া দিবেন, তিনি মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টি ছিল ঝোপে ঝাপে, পাছে কোন শত্রু তাঁহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে।

অকস্মাৎ তাঁহার অশ্ব সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, কুতব এজন্য একটুও প্রস্তুত ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। পরমুহূর্ত্তেই অশ্ব আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল, কিন্তু আর অগ্রসর হইতে চাহিল না; কুতব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তখন

তিনি ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া ব্যাপার কি দেখিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই দুশ্চিন্তায় তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল,—বেচারা অশ্ব খোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিল। নিরুপায় কুতব তাহাকে বল্গা ধরিয়া লইয়া চলিলেন।

অনেক দূরে একটা আলোক দেখা যাইতেছিল, কুতব সেই আলোকের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। নিকটে পৌঁছিয়া দেখিলেন সেটা একটা মুসাফেরখানা ; তাহারই দ্বারের আলোক অতদূর হইতে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

দ্বার অর্গল বদ্ধ ছিল। কুতব হাতিয়ার দিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। কুতব তখন পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী জানালা দিয়া একটা লোক উঁকি মারিয়া দেখিল। কুতব বলিলেন,—"বাপু রাত কাটাবার মত একটু জায়গা দাও!"

কোন কথা না বলিয়া লোকটা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল,—ভাবে বোধ হইল যেন সে বধির। পথশ্রান্ত কুতবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল ; কটিবন্ধ হইতে টোটা ভরা পিস্তলটা বাহির করিয়া লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওঃ! তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না বুঝি? তা বেশ, এই এর কথা ঠিক বুঝবে!"

লোকটা ত্বরিতে জানালা হইতে সরিয়া গেল। পরক্ষণেই দ্বার খুলিয়া গেল এবং সরাইওয়ালা আভূমি নত হইয়া কুর্ণিশ

করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া বলিল,—"জনাবালি, আমি কাণে একটু কম শুনি, একটু জোরে কথা ব'লবেন।"

লোকটার গোস্তাকি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না; তিনি পুনরায় তাহার দিকে পিস্তল তুলিলেন। লোকটা তাড়াতাড়ি জানু পাতিয়া যুক্তকরে বলিল,—"দোহাই জনাব, প্রাণে মারবেন না, আমি আপনার গোলাম।"

"হুঁ, পথে এস। নাও এখন আমায় ঘোড়া বাঁধবার জায়গাটা দেখিয়ে দাও!"—বলিয়া তিনি আপনার অশ্বটীকে লইয়া অগ্রসর হইলেন, লোকটা তাঁহার অনুসরণ করিল।

ঘোড়াটীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাঁধিয়া তাহার ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া দিলেন, তাহার পর লোকটার নির্দ্দেশ মত একটা কক্ষে উপবেশন করিয়া আদেশ দিলেন,—"সিরাজী, সেরা যা আছে নিয়ে এস।"

"যো হুকুম জনাব, খুব ভাল সিরাজী আনছি, খুব ভাল— যতদূর ভাল হ'তে পারে। তা আপনি কেন ওপরের ঘরে চলুন না; সেখানে বিছানা বালিস আছে, খেয়ে দেয়ে সেইখানেই ঘুমুবেন?"

"না, এইখানেই আমি রাত কাটাব বিছানা-টিছানার বড় একটা দরকার হবে না—তুমি শীগ্‌গির সিরাজী আন।"

লোকটা চলিয়া গেল।

কুতব একবার ভাল করিয়া কক্ষটা দেখিয়া লইলেন। কক্ষটী ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যস্থলে একটা মেজ এবং তাহার তিনদিকে তিনটি

টুল। কুতব একটা টুলের উপর বসিয়া অন্যটির উপর পদস্থাপন করিলেন। তাহার কটিদেশ হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর হাতের নিকট রাখিলেন।

লোকটা বহুক্ষণ পরে সিরাজী এবং একটা পানপাত্র দিয়া গেল। কুতব সিরাজীর কিয়দংশ পান করিয়া অবশিষ্টাংশ আলোকের নিকট রাখিয়া দিলেন। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ডিবা অশ্রান্তভাবে ধূম উদ্গীরণ করিতেছিল।

কুতব বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলেন সরাই-ওয়ালা আর একজন সৈনিককে লইয়া সেইদিকে আসিতেছে। তাঁহাকে নিদ্রোত্থিত দেখিয়া লোকটা বলিল,—"জনাব, আপনার দলের আর একজন এসেছেন, ইনিও পাঠাণ।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একজন তরুণ যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার অঙ্গে পাঠাণ সেনার পরিচ্ছদ।

কিয়ৎক্ষণ তাঁহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অকস্মাৎ কুতবের স্মরণ হইল পিস্তলটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে—কিন্তু কি করিয়া সেটা তুলিয়া লওয়া যায়?

সিরাজীর বোতলের পার্শ্বেই পিস্তলটা পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ কুতব হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল,—"বন্ধু, একটু সিরাজী দিই, খাও!"

যুবক ত্বরিতে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল,—"আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমিই নিচ্ছি!"

যুবক তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিল; মোগল ও পাঠাণের পরিচ্ছদের মধ্যে যে ক্ষীণ পার্থক্য ছিল, যুবকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তাহা অধিক্ষণ টিকিল না। কুতব যে মোগল যুবক তাহা বুঝিয়া ফেলিয়াছিল।

যুবক পিস্তলের দিকে হস্ত প্রসারিত করিবামাত্র কুতব তাহার হাতখানি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন; তাঁহার শরীরে যথেষ্ঠ বল ছিল। যুবক যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

কুতব ততক্ষণে অপর হস্তে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, —"হ্যাঁ, এইবারে এক কাজ করুন, আপনার একটা হাত খালি আছে ঐ হাতে করে কোমরবন্ধ থেকে পিস্তলটা বার করে টেবিলের ওপর রাখুন, হ্যাঁ, ঐ ঠিক হয়েছে, আর হাত দেবেন না ওতে; আমি ভারী রাগী মানুষ, একটুতেই বড় রেগে উঠি। আচ্ছা বেশ, এইবার কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ারটা খুলে রাখুন।

যুবক তাঁহার কথা মত অস্ত্রগুলা খুলিয়া মেজের উপর রাখিয়া দিল।

কুতব আপনার পিস্তলটা কোমরবন্ধে গুঁজিয়া পানপাত্রে সিরাজী ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "তুমি আমার বন্দী; এইবারে চল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাদসা কে দেখবে।"

"বাহাল্লালোদি পৃথিবীর······"

"জাহান্নমে যাক বাহাল্লালোদি, আমি ব'লছি আকবর বাদসার কথা।" অকস্মাৎ মুখ তুলিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, যুবক বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কি একখানা কাগজ বাহির করিয়া অগ্নিমুখে

ধরিয়াছে ; মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া কুতব আলোটা নিভাইয়া দিলেন এবং পরক্ষণেই যুবকের হস্ত হইতে অর্দ্ধদগ্ধ কাগজখানা কাড়িয়া লইলেন।

বাহিরে তখন উষার কনক রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই আলোকে কুতব কাগজখানা পড়িতে চেষ্টা করিলেন।

যুবক একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"ওঃ! তা হ'লে আপনি মোগল, আমি মনে করেছিলুম পাঠাণ!"

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া কুতব বলিলেন,—"তুমি ?"

"আমিও মোগল।"

"তবে পাঠাণের পরিচ্ছদে কেন বালক ?"

"পাঠাণদের দেশ দিয়ে আসতে হবে বলেই আমি এই ছদ্মবেশ ধরেছি। আর আমি বালক নই রমণী!"

"রমণী ? কার কাছে যাবে তুমি ?"

উষার কনক রেখা আসিয়া যুবক-বেশী যুবতীর মুখের উপর পড়িয়াছিল। কুতব একবার পত্রখানার দিকে এবং পর মুহূর্ত্তে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে ? আমি যে রোসেনাকে লিখেছিলুম।"

যুবতী একবার ভাল করিয়া কুতবের মুখের দিকে চাহিল... না তাহার ভ্রম হয় নাই···এ মুখ ভুল হইতেই পারে না!

যুবতী কুতবের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার অধর চুম্বন করিয়া বলিল,—"প্রিয়তম, তোমার রোসেনাকে আজ চিনতে পারছ না ?"

"রোসেনা—রোসেনা তুমি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? তুমি এখানে এলে কেন?"

"তোমার চিঠি পেয়ে আমি কোন মতেই আর বাড়িতে থাকতে পারলুম না, কেমন ক'রে আমার প্রিয়তম শত্রু নাশ ক'রছে, তা দেখবার জন্যে অধীর হ'য়ে উঠেছিলুম।"

কুতব তাহার অধর পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"চল এই বেলা আমরা বেরিয়ে পড়ি, এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।"

কুতব তাঁহার বন্দিনীকে লইয়া ক্ষুণ্ণ মনে যাত্রা করিলেন।

বিবেকের দংশন।

[১]

"বুঝেছ ?"

"কিন্তু..."

"না, আর আমি তোমার ও কিন্তু-টিন্তু শুনতে চাই না,যা বল্লুম, এ হওয়া চাই-ই, তা নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রব।"

"দেখ, বলি কি জান..."

"না, না, কোন কথা না, কোন ওজর না, আমি কিচ্ছু শুনব না, এটা হওয়া চাই-ই! তারিণী মুখুজ্যের মেয়ে আমি কথাও যা, কাজও তা!"—বলিয়া গৃহিণী দর্প ভরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কর্ত্তা প্রেমচাঁদ বাবু চিন্তিত মুখে বহির্বাটিতে আসিয়া বসিয়া হাঁকিলেন,—"রাইচরণ!"

নেপথ্যে উত্তর হইল,—"হুজুর!"

পরমুহূর্ত্তেই কুস্তিগীর পালোয়ানের মত একজন সবল সুস্থকায় পুরুষ আসিয়া হুকুমের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। প্রেমচাঁদ বলিলেন,—"ক'লকেটা ব'দলে দে!"

রাইচরণ বিনা বাক্যব্যয়ে নির্ব্বাপিত কলিকাটা গড়গড়ার মস্তক হইতে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রেমচাঁদ বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। একটার পর একটা করিয়া কত কথা আজ তাঁহার মনে আসিতেছিল! সেই অতীত! মধুর সুদূর অতীতের সেই দিনগুলির ছবি আজ

বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একটার পর একটা করিয়া খেলিয়া যাইতে লাগিল।

সেই অতীতের কথা মনে করিতে গিয়া তাঁহার সর্ব্ব প্রথম একখানি মুখ মনে জাগিয়া উঠিল,—সে তাঁহার বন্ধু উপেন। বাল্য হইতেই তাঁহারা দুইজনে কি গভীর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন! যেন দুইটী সহোদর ভ্রাতা! শিক্ষকেরা অনেক সময় তাঁহাদের প্রীতি দেখিয়া পরস্পরকে ভাই বলিয়াই ভ্রম করিতেন।

তাহার পর দিনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সৌহৃদ্যও ঠিক সেই পরিমাণে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রেমচাঁদের মা তাঁহার শৈশবেই পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু উপেনের জননীর স্নেহে ও যত্নে অনেক সময় তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেন না যে, তাঁহার জননী নাই—তিনি মাতৃহারা।

তাহার পর দুই বন্ধু যে দিন লেখাপড়া শেষ করিয়া জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন সেইদিন সর্ব্ব প্রথম তাঁহাদের বিচ্ছেদ হইল। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা।

উভয় বন্ধু পরস্পরের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেও মন-দর্পণ হইতে কেহই কাহারও প্রতিবিম্ব মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। তাহার পর দীর্ঘ নয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন প্রেমচাঁদ উপেনের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন;—তাহাতে লেখা

ছিল যে, উপেনবাবু মৃত্যু শয্যায় —একবার বন্ধুর সহিত শেষ সাক্ষাৎ একান্ত বাঞ্ছনীয়। টেলিগ্রাম পাইয়া প্রেমচাঁদ মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া বন্ধুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

উপেনবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মরণ সেখানে থানা দিয়া বসিয়াছে,—যেন সে বাটীর সকলকেই সে লইয়া যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর! গ্রামে তখন প্রায় ঘরে ঘরে বসন্ত হইতেছিল এবং যাহাকেই এই কাল রোগে আক্রমণ করিতেছিল, সেই মরণের বিশ্ববিজয়ী প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছিল।

প্রেমচাঁদ উপেনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি বসন্তের দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। বন্ধুকে দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আজ তাঁহার সংসারে আপন বলিতে একটী সাত বৎসরের শিশুপুত্র ব্যতীত আর কেহই নাই। দুরারোগ্য বসন্ত রোগে পর পর মাতা ও পত্নীকে বিসর্জ্জন দিয়া আজ স্বয়ং তাঁহাদের অনুসরণ করিতে বসিয়াছিলেন। বন্ধুকে দেখিয়া সকল কথা তাঁহার নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল। প্রেমচাঁদও বন্ধুর দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কতক্ষণ পরে উপেন বাবু বলিলেন,—"ভাই, মরণ আমার সবই হরণ ক'রে নিয়েছে, একমাত্র আমার ছেলে রমেন বাকী, এখানে থাকলে হয়ত সেও বাদ যাবে না, তাকে তুমি নিয়ে যাও, নিজের ছেলের মত দেখো, বেশী আর কি ব'লব?"

তাহার পর তিনি বন্ধুকে উইল দেখাইলেন। তাহাতে তাঁহার বার্ষিক চব্বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি পুত্র রমেনকে দিয়াছিলেন, তবে সে সাবালক না হওয়া অবধি প্রেম-চাঁদই তাহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। উইলের শেষে লেখা ছিল,—যদি তাঁহার পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে, সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বন্ধু প্রেমচাঁদ বা তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ পাইবেন।

প্রেমচাঁদ উইলের এই শেষ অংশটা লইয়া একটু আপত্তি উত্থাপন করিয়া ছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি তাঁহার সে আপত্তি টিকে নাই।

ইহার দুইদিন পরেই উপেনবাবু পুত্র ও বন্ধুর মায়া কাটাইয়া মাতা ও পত্নীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।—সে আজ এক বৎসরের কথা!

প্রেমচাঁদ বন্ধুর উইল ও রমেনকে লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তখন অপুত্রক। তাঁহার পত্নী হেম এই সুন্দর সদানন্দ পুত্রটীকে কোলে পাইয়া মাতৃত্বের মধুরানন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন।

অদৃষ্ট দেবতা আমাদের ভাগ্যসূত্র লইয়া যে কি জাল বয়ন করিতেছেন, ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব আমরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। রমেন এই নূতন সংসারে আসিবার ঠিক একটী বৎসর পরে হেমের একটী কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল।

দিনের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র শিশুটীর উপর তাঁহার মায়া যে পরিমাণ বাড়িতে লাগিল, রমেনের উপর স্নেহ তাঁহার ঠিক সেই পরিমাণেই কমিয়া যাইতে লাগিল। তাহার একটা কারণও ছিল। তাঁহারই স্নেহে মানুষ হইয়া রমেন পরে বিপুল বিষয়ের মালিক হইবে, আর তাঁহার কন্যা চিরদিনই দরিদ্র থাকিবে! কিন্তু রমেন যদি মরিয়া যায়······তবে...তবে......সে কি সুখ, কি আনন্দ! সন্তানের সুখের জন্য মাতা করিতে পারেন না, সংসারে এমন কাজই নাই। হেমও নিশা দিন রমেনের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন।

কথায় বলে,—'যাকে বলে মর মর, সে পায় দেবীর বর।'—রমেনের অবস্থাও তাহাই দাঁড়াইয়াছিল। বালক দিব্য সুস্থ শরীরেই হাসিয়া খেলিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল।

হেমের কিন্তু আর কোন মতেই বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি স্বামীকে নানা উপায়ে বশ করিয়া রমেনকে পৃথিবী হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রেমচাঁদ প্রথমে ততটা গ্রাহ্যই করেন নাই, কিন্তু স্ত্রী যখন বলিলেন ইহা না করিলে তিনি রজ্জু গলে দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিবেন, তখন তিনি বিশেষরূপই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; কারণ হেমকে তিনি বিলক্ষণই চিনিতেন।—স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি অনর্থক ভয় প্রদর্শন করিতেছেন না, কথায় ও কার্য্যে তাঁহার বড় একটা অনৈক্য হইবে না।

[২]

গড়গড়া টানিতে টানিতে প্রেমচাঁদ চিন্তিত মুখে ডাকিলেন,—"রাইচরণ!"

নেপথ্যে উত্তর হইল,—"হুজুর!"—এবং পরমুহূর্ত্তেই রাইচরণ নশ্য সশরীরে প্রভুর সমীপস্থ হইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নশ্য জাতিতে মুসলমান। রাইচরণ প্রভুর কার্য্যে কোন দিন এতটুকু গাফিলতি করে নাই;—প্রেমচাঁদ আদেশ করিলে সে বিনা দ্বিধায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিত।

প্রেমচাঁদ ডাকিলেন,—"রাইচরণ!"

"হুজুর!"

"আমার কাছে সরে আয়।—আরও—আরও কাছে!"

রাইচরণ তাহাই করিল।

প্রেমচাঁদ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন। রাইচরণ বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মুখে কথা সরিল না।

প্রেমচাঁদ বলিলেন,—"যেমন ক'রে পার্‌বি একাজটা তোকে ক'রতেই হবে।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল,—"যে আজ্ঞা!"

"আজই করা চাই।"

"আজই?"

"হ্যাঁ। আর দেখ খুব সাবধান! ডানহাতের কাজ বাঁহাতে যেন না টের পায়। বুঝলি?"

"সে আর বলতে হবে না হুজুর!"

"তা হ'লে কখন ক'রবি!"

"সন্ধ্যের সময়।"

* * *

বৈকালে রমেন খেলা করিতেছিল; রাইচরণ গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"দাদাবাবু! চল বেড়িয়ে আসি!"

বালক সানন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইল। দুইটী ক্ষুদ্র হস্তে রাইচরণের শিরা-বহুল হাতখানা ধরিয়া আনন্দ চঞ্চল কণ্ঠে বলিল,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বেশ হবে রাইচরণ, চল!"

রাইচরণ স্বাভাবিক ভাবেই বালকের হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল।

কয়েকটা রাস্তা ঘুরিয়া তাহারা নদীর তীরে আসিয়া পড়িল। বর্ষায় পদ্মা দুই কূল প্লাবিত করিয়া খরতর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

রাইচরণ বালককে লইয়া নদী তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। বালক চতুর্দ্দিকে চাহিয়া নৌকার সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু নিকটে একখানাও নৌকা দেখিতে পাইল না। দূরে, অতি দূরে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল, কিন্তু তাহারা যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল সেখান হইতে নৌকখানা মোটেই স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না।

রাইচরণ একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিল জন

মানবের সাড়া নাই। পশ্চিমে তখন সূর্য্যদেব ডুবিয়া গিয়াছেন; গোধূলির আলোকে পৃথিবী ভরিয়া উঠিয়াছিল।

রাইচরণ ধীরে ধীরে রমেনের গলদেশে হাত রাখিয়া বলিল,—"ঐ দেখ, অনেক দূরে একখানা নৌকা রয়েছে!"

রমেন নৌকা দেখিবার জন্য সেই দিকে চাহিতেই তাহার বোধ হইল রাইচরণের শিরাবহুল হাতখানা যেন একটু অস্বাভাবিক ভাবেই তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। ক্রমেই সে গলদেশে ব্যথাটা অধিক পরিমাণে অনুভব করিতে লাগিল। তখন সে সম্পূর্ণ নির্ভরতার সহিত বালসুলভ সরলকণ্ঠে অনুনয়ের সহিত বলিয়া উঠিল,—"উঃ! রাইচরণ, ছাড় ছাড়, বড় লাগছে যে!"

রাইচরণ মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইল। ক্ষণিকের জন্য তাহার একটা কথা মনে পড়িল। সেবার সে যখন দেশে গিয়া তাহার সাতবৎসরের বালক পুত্রকে আদর করিতে গিয়া একটু অধিক জোরে টিপিয়া ধরিয়াছিল তখন সে যেমন নির্ভরতার সহিত আপনার ব্যথার কথা জানাইয়াছিল, রমেনের স্বরটাও যে ঠিক তেমনি করিয়া তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত দিল! রাইচরণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হা ভগবান! তাহার এতবড় বলিষ্ঠ দেহ খানার মধ্যে এত কোমল হৃদয় দিয়াছ কেন?

রাইচরণের এই হৃদয়-চাঞ্চল্য মাত্র মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহার পরই তাহার প্রভুর কথা মনে পড়িল;—মনে পড়িল একাজ করিতে না পারিলে প্রভুর নিকট তাহাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে! না—না, মুসলমান সে, নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেই

—নিমকহারাম সে কোন দিন হইবে না—কোন দিন না, কিছুতেই না।

পুনরায় সে রমেনের কণ্ঠ মর্দ্দনে উদ্যত হইতেই বালক আবার তেমনি করিয়া তাহার অন্তর বিচলিত করিয়া তুলিল।

তখন বিপন্ন হইয়া রাইচরণ বালককে দুই হস্তে শূন্যে তুলিয়া লইয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। সে পর মুহূর্ত্তেই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কর্ণে তাহার বালকের অসম্পূর্ণ করুণ আহ্বান,—"রাইচ—" এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে একটা গুরুভার পতনের শব্দ যুগপথ প্রবেশ করিল।

রাইচরণ ফিরিয়া দেখিল বর্ষার ভরা নদী তরতর বেগে আপন গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে,—সেখানে রমেনের চিহ্ন মাত্র নাই। পৃথিবীটা তখন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছিল; সভয় দৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া রাইচরণ ধীরে ধীরে আপন গন্তব্য স্থানে ফিরিয়া গেল।

* * * *

রাত্রি তখন আটটা বাজিয়াছিল। গৃহিণী হেম কর্ত্তার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"হ্যাঁগা, আজ রমেন কোথা গেল, তাকে ত' কই দেখতে পাচ্ছি না?"—সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে একটা ইসারা হইয়া গেল। গৃহিণীর মুখে অল্প হাসি ফুটিল।

প্রেমচাঁদ বলিলেন,—"সে কি? রমেন তা হ'লে গেল কোথা? আচ্ছা, দাঁড়াও, রাইচরণকে জিগেস করি!"—তখনই তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন—"রাইচরণ!"

"হুজুর!"—বলিয়া রাইচরণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল।

প্রেমচাঁদ বলিলেন,—"হ্যাঁরে! রমেন কোথায় বল দেখি?" আবার একবার প্রভু ভৃত্যের চোখে ইসারার তড়িৎ খেলিয়া গেল।

রাইচরণ বলিল,— "তাত' জানি না হুজুর!"

"সে কি রে? জানিস না? খোঁজ খোঁজ, দেখ ছেলেটা গেল কোথা!"

রাইচরণ নিরুদ্দিষ্ট রমেনের অনুসন্ধান করিতে বাহির হইল। প্রেমচাঁদও গৃহে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না;— স্বয়ং রমেনের সন্ধান করিতে বাহির হইলেন।

শুনা যায় সে রাত্রে এবং তাহার পরদিন প্রাতে প্রেমচাঁদ পল্লীর ঘরে ঘরে সাশ্রুনেত্রে রমেনের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহার এবং রমেনের'ও বটে, যে কোথায়ই সেই পিতৃমাতৃহারা অভাগার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

[৩]

তাহার পর দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ কাটিয়া গিয়াছে।

সে বৎসর প্রেমচাঁদ বাবুর দেশে গ্রীষ্মকালটায় ঘরে ঘরে বসন্ত হইতেছিল। গ্রামের অধিকাংশ গৃহেই ক্রন্দনের রোল শোনা যাইতেছিল। প্রেমচাঁদ তখন রমেনের বিষয় আত্মসাৎ করিয়া তাহারই তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দেশান্তরে গিয়াছিলেন।

এ কয়বৎসর প্রেমচাঁদ বাবুর স্বামী স্ত্রীর মনের সুখ মোটেই ছিল না। রমেনকে হত্যা করিবার পর তাহার বিষয় সম্পত্তিগুলা

যেন বিষধর সর্পের মতই তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। হেমই এ কার্য্যে প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন, কিন্তু অন্তর যাতনাটা তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। অন্তর ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া অবশেষে রাইচরণকে তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত করিলেন;—তাহাকে দেখিলেই আপনাদের নারকীয় ষড়যন্ত্রের স্মৃতি নূতন করিয়া অন্তর দগ্ধ করিত।

প্রেমচাঁদ যখন বিদেশে এবং পল্লীর ঘরে ঘরে যখন বসন্ত মহামারীর মতই জন ক্ষয় করিতেছিল, সেই সময় একদিন হেমের বসন্ত হইল। দিনের পর দিন অনন্ত যাতনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ীতে সেবা করিবার জন্য মাত্র দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা নলিনী এবং একজন দাসী;—সতী।

নবম দিনে হেম বসন্তর যাতনায় অধীর হইয়া শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন;—বাহিরে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র আম কাঁঠাল পাকাইতেছিল, এরূপ সময় প্রেমচাঁদ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পত্নীর অসুখের কথা তিনি কিছুই জানিতেন না; এক্ষণে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নলিনী ও সতীর সন্ধান করিলেন কিন্তু সারা বাড়ীটার মধ্যে কোথাও তাহাদের সাড়াশব্দ পাইলেন না। হেম ক্ষীণকণ্ঠে জানাইল তাহারা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে।

বেলা তখন প্রায় দুইটা। তখনও অবধি নলিনী স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল না কেন, ইহা ভাবিয়া প্রেমচাঁদ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রুগ্নার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আরও কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া

গেল। হেম তখন বসন্তের অন্তর জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, মুহুর্মুহু তাঁহার জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। প্রেমচাঁদ বুঝিলেন তাঁহার অন্তিম সন্নিকট!

এইভাবে বেলা চারিটা বাজিল। নলিনী তখনও ফিরিল না দেখিয়া প্রেমচাঁদ স্বয়ংই একবার তাহার সন্ধান করিতে বাহির হইলেন।

তাঁহাদের নদীঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র পল্লীখানির সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তিনি নলিনীর কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দূরদেশ হইতে বাটী আসার পরিশ্রান্তি তাহার পর নলিনীর অদর্শনের উৎকণ্ঠা ও মৃতকল্পা পত্নীর বিষয় ভাবিয়া উদ্বেগে তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। অবসাদে তাঁহার সারা দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; কোনমতে শ্রান্ত চরণদ্বয়কে টানিয়া তিনি বাড়ী আসিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছিল। প্রেমচাঁদ বাটী ফিরিয়া দেখিলেন সেখানে জনমানবের সাড়া নাই। অন্ধকারে তিনি মৃতকল্পা পত্নীর রোগশয্যা পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন,—"হেম—ও হেম!"

কোন উত্তর নাই!

তিনি আবার ডাকিলেন,—"হেম!"

তথাপি কেহ তাঁহার ডাকে সাড়া দিল না। এবার তাঁহার উৎকণ্ঠা ভয়ে পরিণত হইল। তবে কি হেম……?

তিনি হেমের গায়ে হাত দিয়া পুনরায় ডাকিলেন,—"হেম!"

কেহই সে ডাকের উত্তর দিল না। প্রেমচাঁদের মনে হইল হেমের দেহখানা অসাড় হিম হইয়া গিয়াছে! হা ভগবান! আজ একই সঙ্গে পত্নী ও কন্যা হারাইতে হইল! সহসা যেন তাঁহার মনে হইল তাঁহার বহুদিনের মৃত বন্ধু অদূরে দাঁড়াইয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছেন,—"বন্ধুর জল-পিণ্ড লোপ করবার সময় ত কোন কষ্ট হয়নি প্রাণে, তবে আজ নিজের দুর্ভাগ্যে কাঁদ কেন বন্ধু?"

ছায়াবাজীর চিত্রের ন্যায় দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বের ঘটনাগুলা প্রেমচাঁদের নয়নসমক্ষে ভাসিয়া গেল। সেই এতটুকু সুন্দর সুকুমার বালক রমেন! তাহার পিতার মৃত্যুকালে কি গভীর নির্ভরতার সহিতই তাহাকে তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়াছিল। আর তিনি সেই বন্ধুর সরল বিশ্বাস কি ভাবে রক্ষা করিলেন। ছি! ছি! সামান্য অর্থের লোভে লোকে এমন করিয়াও আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়!

তাহার পর তাহার মনে হইল যেন সেই অন্ধকারের মধ্যে রমেন তাহার সেই সারল্যময় দৃষ্টিতে তাঁহারই দিকে চাহিয়া বলিতেছে,—"কাকা বাবু, কেন আমায় এত কষ্ট দিয়ে মারলে?"

ভয়ে, মর্ম্মপীড়ায় প্রেমচাঁদ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন; তাহার পরই তিনি মৃতপত্নীর পার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

* * * *

গ্রীষ্মের সুন্দর প্রভাত। পত্নীর মৃত দেহের সংকার করিয়া প্রেমচাঁদ সেই কতক্ষণ বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। অর্থের উপর,

সংসারের উপর আর তাঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না ;—বসিয়া বসিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, বিষয় সম্পত্তি কোন একটা সৎকার্য্যে দান করিয়া দেশত্যাগ করিয়া কোন একটা বিদেশে চলিয়া যাইবেন।

সহসা তাঁহার কর্ণে একটা শকটের ঘড় ঘড় শব্দ প্রবেশ করিল, পরমুহূর্ত্তেই একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া তাঁহার দ্বারপ্রান্তে থামিল।

কে আসে? এমন অসময়ে আসিবার মত লোক তাঁহার কেহই ছিল না, কাজেই প্রেমচাঁদ বিস্মিত হইলেন।

পরক্ষণেই নলিনী ও একজন যুবক আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। নলিনী সস্নেহে "বাবা" বলিয়া ডাকিয়াই তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রেমচাঁদও হৃতা কন্যাকে বক্ষে ফিরিয়া পাইয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যে সংসার এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাঁহার নিকট নীরস শুষ্ক মনে হইতেছিল, মায়ার যাদুদণ্ড স্পর্শে তাহা পুনরায় সরস সুন্দর হইয়া উঠিল।

সস্নেহে তিনি কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"কোথা গেছ্‌লি মা নলিনী?"

অশ্রুসিক্তকণ্ঠে নলিনী বলিল,—"ঝির সঙ্গে কাল পদ্মায় নাইতে গেছলুম, নেয়ে উঠে ঝি বল্লে তার বাড়ীতে বোনপোর অসুখ, এখুনি একবার দেখে চলে আসবে। কাজেই বাধ্য হ'য়ে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গেলুম। যাবার আগেই আমি জিজ্ঞেস্ করেছিলুম তাদের বাড়ী কতদূর?

"সে বল্লে,—'এই যে মা, কাছেই।'

"কিন্তু অনেকটা পথ চলেও যখন তার বাড়ী পৌঁছুতে পারলুম না, তখন আবার তাকে জিজ্ঞেস করলুম,—'আর কতদূর ঝি ?'

"'এই যে এসে পড়েছি।'—ব'লে সে আমায় একখানা চালা দেখালে। আমরা গিয়ে ভেতর ঢুক্‌লুম, সে ঘরে কেউ ছিল না। ঝি বল্লে,—'তুমি একটু ব'স মা, আমি দেখি আমার বোন কোথা গেল।' এই ব'লে সে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি দোরে ছেকল তুলে দিলে। আমার বিস্ময় ও ভয়ের সীমা রইল না। মাগী চায় কি ?

"ঝি বল্লে,– 'চুপ কর বাছা, বাড়ীতে রুগী রয়েছে!'

"আমি বল্লুম,—'তুই আমায় ঘরে বন্ধ কর্‌লি কেন ?'

"মাগী সে কথার উত্তর দিল না। বহুক্ষণ আমি একা ঘরের মধ্যে বসে রইলুম ;—ত্রিসীমানায় জনমানবের সাড়া পেলুম না। তখন প্রায় বেলা বারোটা, মাগী জানালা দিয়ে আমায় এক ঠোঙা খাবার দিয়ে গেল, তার পর আর কারও সাড়া শব্দ পেলুম না। সন্ধ্যার পর মাগী দোর খুলে আমার হাত ধ'রে চল্‌তে লাগলো। বার বার জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌তে পার্‌লুম মাগী আমায় ক'লকেতা নিয়ে যাচ্ছে। তার কথা শুনে আমি কাঁদ্‌তে লাগলুম, কত কাকুতি মিনতি ক'রে ছেড়ে দিতে বল্লুম, মাগী তা কিছুতেই ছাড়ল না। শেষে ষ্টীমার ঘাটে টিকিট কিন্‌তে গিয়ে রমেনবাবুর চোখে পড়ায়, আমায় কাঁদ্‌তে দেখে উনি কারণ জিজ্ঞেস করেন, তার পর পুলিসের সাহায্যে মাগীর কবল থেকে আমায় উদ্ধার

করেন। উনি না থাক্‌লে আমি এতক্ষণ ক'লকেতার পথে অনেকটা গিয়ে পড়তুম।

প্রেমচাঁদ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে যুবক রমেনকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া পরক্ষণেই দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন। এও কি সম্ভব? দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে যাহার মৃত্যু হইয়াছে সে আজ সশরীরে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান?

[৮]

কথাটা মনে হইতেই উত্তেজনায় তাঁহার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"কিছু যদি মনে না কর বাবা, তবে একটা কথা বলি। তোমার বাপের নাম কি?"

যুবকের সমস্ত মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"বড়ই লজ্জার কথা, আমি বাবার নাম জানি না, অতি অল্প বয়সে আমি পদ্মায় ডুবে গেছলুম, একজন ভদ্রলোক আমায় দয়া ক'রে তুলে আশ্রয় দিয়ে লেখাপড়া শেখান, তার পর আজ ছ' মাস হ'ল তাঁর মৃত্যু হওয়ায় আমি জেটীতে চাকরী করছি।"

আবেগভরে প্রেমচাঁদ রমেনের হাত দুইখানা আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"ধন্য ভগবান! এতদিন পরে তোমার করুণায় আমাদের হারান ধনকে ফিরে পেলুম।"

অতঃপর তিনি রমেনকে একে একে সমস্ত কথা বলিলেন। কেবল তাঁহাদেরই চক্রান্তের ফলে যে রমেন জলমগ্ন হইয়াছিল,

সে কথাটা গোপন করিয়া বলিলেন যে, একদিন সন্ধ্যার সময় আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

আপনার লোকের সন্ধান পাইয়া রমেনের আনন্দের সীমা রহিল না। পরদিনই জেটীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া সে প্রেমচাঁদের গৃহে ফিরিয়া আসিল।

* * * *

হেমের শ্রাদ্ধ চুকিয়া যাইবার কয়েকমাস পরে প্রেমচাঁদ রমেনের করে নলিনীকে অর্পণ করিয়া রমেনের সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া একটা তৃপ্তির শ্বাস ফেলিয়া বাচিলেন।

অল্পদিন পরেই তিনি কন্যা জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ বন্দনা করিবার জন্য কাশীবাসী হইলেন।

মনের মতন।

গ্রীস মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি রাণীর মত সুন্দরী!

তাহার একদিকে দেবতার লীলা-নিকেতন সুউচ্চ ওলিম্পাস, রাণীর প্রিয় নিকেতনরূপ আটিকা পর্ব্বত শ্রেণী; অন্যদিকে ইলিস দুর্গ অভেদ্য, অজেয়। আবার পর্ব্বত পাদদেশে হরিৎ তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি; দিগন্তরে গাঢ় হরিৎবর্ণ পত্র পুষ্প শোভিত সিথিয়া নিকুঞ্জ! টেম্প মালভূমি নবজাত শ্যামদুর্ব্বাদল সুশোভিত। রাখালের মধুর বংশীনিনাদে সে স্থান ব্রজভূমি বলিয়া বোধ হয়।

প্রত্যহ উষার আলোকে যখন পৃথিবী অন্ধকার মুক্ত হইয়া একটা স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিত, থারসেনডা ও ডরিস সেই সময় এই স্থানে প্রাতঃভ্রমণ করিতে আসিত। সারা গ্রীসের মধ্যে ডরিস তখন শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, আর থারসেনডা শ্রেষ্ঠ সুন্দর! যেন নিপুণ শিল্পির শ্রেষ্ঠ প্রতিমা দুইটা! প্রকৃতি বুঝি মদন ও রতির আদর্শে এ দুইটাকে গঠন করিয়া ভ্রম ক্রমে ধরায় পাঠাইয়াছিলেন।

বসোরা গোলাপও ডরিসের সেই সুন্দর যৌবন পুষ্ট লোহিতাভ কপোলের নিকট লজ্জিত হইয়া পত্রপুঞ্জে আপনাকে লুকাইতে প্রয়াস পাইত। তাহার প্রকৃতি দত্ত সৌন্দর্য্য যৌবনের মোহন তুলিকা স্পর্শে শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই উজ্জ্বল নয়নতারকা যে দেখিত তাহারই মনে হইত বুঝি রাত্রের শুকতারা তাহা অপেক্ষা নিষ্প্রভ, এমনি তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টি!

ডরিসকে একবার দেখিলেই যে কেহ তাহাকে ভাল বাসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত ; ডরিস কিন্তু থারসেনডা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিত না। সারা পৃথিবীর মধ্যে তাহার প্রেম পাত্র হইয়াছিল থারসেনডা। ডরিস মধ্যে মধ্যে মুকুরে ফলিত আপন প্রতিবিম্ব দেখিত, তাহার ভয় হইত বুঝি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপের উজ্জ্বলতাও কমিয়া যাইতেছে, আর বুঝি সে থার-সেনডাকে আপন করিয়া রাখিতে পারে না! তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার বসন-ভূষণ-রূপ-যৌবন সকলই যে থারসেনডার জন্য।

থারসেনডাও ডরিস বলিতে আত্মহারা হইয়া পড়িত। সর্ব্বদাই ডরিসের কথায় তাহার হৃদয় পূর্ণ থাকিত। ডরিস তাহার নিকটে থাকিলে সে আর সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষার বস্তু খুঁজিয়া পাইত না।

তাহাদিগের এই পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে একটী মাত্র দুঃখ ছিল। তাহাদের স্বেচ্ছায় পরিণীত হইবার উপায় ছিল না। বসন্ত উৎসবে যে রমণী সারা দেশের মধ্যে রূপের রাণী বলিয়া নির্ণীত হইবে তাহার সহিত শ্রেষ্ঠ সুন্দরের বিবাহ হইবে, ইহাই তখন নিয়ম ছিল।

ডরিস ভাবিত থারসেনডা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সুন্দর বলিয়া নির্ণীত হইবে আর অন্য কোন রমণী শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবে। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উভয়ে তাহারা পরিণীত হইবে। আর অভাগিনী ডরিস শুধু ব্যর্থ হৃদয়ের আকুল বেদনায় সারা জীবন কাঁদিয়া ফিরিবে! উঃ কি দুর্ভাগ্য তাহার!

আবার থারসেনডা ভাবিত, ডরিস নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবে, আর অন্য একজন নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ সুন্দর যুবকের সহিত ডরিসের শত আপত্তি সত্ত্বেও পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যাইবে। অভাগা সে, চিরদিন শুধু অতৃপ্ত-হৃদয়ের হাহাকার বুকের মধ্যে গোপন করিয়া জীবনে নরক ভোগ করিবে। কি কঠোর এই বিধিলিপি!

* * * *

দিনের পর দিন চলিয়া গেল। ক্রমে উৎসবের দিন আসিয়া পড়িল। সারা দেশটায় একটা উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল। সুন্দর যুবক ও যুবতী মহলে একটা আশা আতঙ্কের ঊর্ম্মি বহিয়া গেল। সকলেই আশা করিতেছে আজ আমিই শ্রেষ্ঠ রূপবান বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। আশা বা আনন্দের সঞ্চার হয় নাই শুধু ডরিস ও থারসেনডার চিন্তা-দগ্ধ প্রাণে!

কি সে সঙ্কট মুহূর্ত্ত। হয় জীবন উৎসর্গ আর নয় প্রেমের জয়-জয়ন্তী!

প্রথমে আসিল ইসমিণী!

ঊষার রক্তিম আলোকের মতই পরিপূর্ণ তাহার রূপ, কবি কল্পিত মানসী প্রতিমার মতই সুঠাম তাহার দেহলতা। সে প্রতিমা ভেনাসের প্রতিমূর্ত্তি নহে, লাবণ্যের প্রতিচ্ছবি!

তাহার পর আসিল জারফি!

সে দেহের সৌন্দর্য্য ও লালিমা, অঙ্গভঙ্গি ও গতি, বনদেবীর মতই সুন্দর, মনোরম! মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত প্রখর তাহার চক্ষের

চাহনী; সে সৌন্দর্য্য বাসনার উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ প্রেম পরিপ্লাবিত করিতে পারে না। তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছা হয়, তুষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না।

তাহার পর আসিল ডারসী।

তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীদ্বয়ের সহিত তাহার কোন অংশেই সমতা ছিল না। বিশ্ব-প্রেমই তাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব; বিশ্ব প্রেমিকার রূপ না থাকিলেও ক্ষতি নাই, তাহারও তেমন রূপের চাকচিক্য ছিল না। তাহার প্রকৃতিগত ঔদ্ধত্য দেহের লালিত্যহানি করিয়াছিল। লাবণ্য তাহার সংস্পর্শে আসিতে শঙ্কিত হইত। উদ্ধতা জুনোর মত সে জয়-মুকুট দাবী করিতে আসিয়াছিল, রূপ দেখাইয়া জয়লাভ করিতে আসে নাই।

তাহার পর আরও অনেক গ্রীক সুন্দরী আপনাদের রূপের আলোকে দিগ্‌দেশ উদ্ভাসিত করিয়া সেই প্রাঙ্গণ ভূমে উপনীত হইল। সেই সুন্দরীগণের মিলিত রূপজ্যোতিঃতে সারা প্রাঙ্গণ জ্যোৎস্নার আলোকের মত রূপালোকে ভরিয়া উঠিল।

সকলের শেষে আসিল ডরিস।

সেই শান্ত সুন্দর রূপ দেখিবার জন্য উন্মুখ ভাবে মিলিত সকল দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। দর্শকদের মনে হইল, বুঝি ভেনাস দেবী মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপন মন্দির প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন!

ইতিপূর্ব্বে যে আপনাকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া স্থির করিয়াছিল, ডরিসকে দেখিয়া এতক্ষণে সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল;

লজ্জায় তাহার সারা মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, পর মুহূর্ত্তেই দারুণ নৈরাশ্যে তাহার সারা হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অস্থিরচিত্তে সে চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিল।

অদূরে বিচারকগণ সারি দিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারাও ডরিসের স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন।

ক্রমে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইল। বিচারকগণ গভীর মনযোগ সহকারে প্রত্যেক সুন্দরীর রূপ দেখিলেন। শিল্পের চরম আদর্শ হইবার মত রূপ ডরিস ব্যতীত অন্য কাহারও দেখা গেল না। যে বাস্তব সুন্দরী, তাহার সারা দেহখানিই সমান সুন্দর হইবে; যাহার মস্তকের গঠনটী অনুপম, তাহার দেহের অন্যান্য অংশ তেমন সুন্দর নহে; কাহারও বা শরীরের আকৃতিটী সুন্দর কিন্তু রূপের উজ্জ্বলতা নাই; এমনি একটা একটা খুঁত বাহির হইতে লাগিল। এরূপ সুন্দরী এ জয়মুকুটের অধিকারিণী নহে। বিধাতা মুক্ত হস্তে যাহাকে সকল সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন কেবল সেইই এ মুকুটের অধিকারিণী।

কতক্ষণ পরে বিচার কার্য্য শেষ হইল।

মন্দিরমধ্যে ভেনাস দেবীর একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সে মূর্ত্তি বিখ্যাত শিল্পী কিভিয়াসের কল্পনা প্রসূত। উহাই তাঁহার কৃত শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি! প্রকৃতি তাঁহার কল্পনা নেত্রের সম্মুখে যতটুকু সৌন্দর্য্যের আবরণ মোচন করিয়াছিল, কঠিন লৌহাস্ত্রে তিনি তাহার সবটুকুই নির্জ্জীব পাষাণ বক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। এমন সুন্দর মূর্ত্তি সারা গ্রীসে আর একটীও ছিল না।

প্রধান পুরোহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া ডরিসের মস্তকে জয়মুকুট পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"তুমিই এ মুকুটের অধিকারিণী! আজ থেকে তুমি রূপের রাণী হ'য়ে সুন্দরী মহলে রাজত্ব কর। এ নিষ্পত্তিতে কারো কোন অসন্তোষের কারণ থাকবে না,—থাকতে পারে না। আজ থেকে তারা রূপের রাজ্য তোমায় ছেড়ে দিতে বাধ্য; আর সুন্দরী ব'লে তারা গর্ব্ব করতে পারবে না।"

ডরিসের প্রধান শত্রুও তাহার এ বিজয় বার্ত্তায় আনন্দিত হইল। ডরিস কিন্তু এ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। যদি থারসেনডা শ্রেষ্ঠ সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়! যদি না হয়! এমনি একটা ভয় তাহার সমস্ত আনন্দ পণ্ড করিয়া দিল। যদি বিচারকের দৃষ্টিতে সে সুন্দরতম প্রতিপন্ন না হইয়া অন্য কেহ প্রতিপন্ন হয়, তবে—তবে? তবে ডরিসকে তাহার গলাতেই মাল্যদান করিতে হইবে! উপায় নাই—ওগো উপায় নাই! হৃদয় কাঁদিয়া কাটিয়া লুটিয়া পড়িলেও ইহার অন্যথা হইবে না। জগতের সকলেই আজ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, সারা সংসারে কেহই তাহার প্রতি মমতা বা করুণা প্রকাশ করিবে না। হায় ভেনাস দেবী, এ তাহার কি করিলে?

দেশের আচার অনুসারে একজন পুরোহিত ডরিসকে ভেনাস দেবীর মত সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন। মস্তকে তাহার একটা আবরণ টানিয়া দেওয়া হইল। কে বলিয়া দিবে ডরিস এ আবরণ মোচন করিয়া কোন পুরুষের মুখ দর্শন করিবে?—কাহাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়া লইবে?

যেখানে নবীন দম্পতির বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইবে, সে স্থানটী প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। একটা বীণার ঝঙ্কার ডরিসকে সেই স্থানে উপনীত হইতে ইঙ্গিত করিল। আবার ডরিসের সর্ব্বশরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কে জানে তাহার ভাগ্যে কি আছে? কম্পিত পদে আবৃত বদনা ডরিস পুরোহিতের সহিত অগ্রসর হইল। তাহার অবস্থা তখন দেবতার নিকট মানত করা বলিদানের পশুটীর মত ভয়-কম্পিত, ভেনাস দেবীর প্রিয়-পাত্রীর মত আনন্দ চঞ্চল নহে।

এপোলো ও ভেনাসের প্রধান পুরোহিত দুইজন দম্পতিদ্বয়কে দেবতার বেদীর পার্শ্বে দাড়াইতে বলিলেন। তাহাদের পরস্পরকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইল না। দেশাচার মত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

যুবকের মুষ্টির মধ্যে ডরিসের হাত খানি কাঁপিয়া উঠিল। সে তখন আপনার ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছিল। মুখের আবরণ মোচন করিয়া সে কি দেখিবে—এ যদি থারসেনডা না হয়? হায় প্রিয়তম থারসেনডা!

ক্রমে আবরণ মোচন করিবার সময় আসিল। ডরিস ক্রমাগত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আবরণ মোচন করিয়া সে আজ কাহাকে স্বামীর আসনে দেখিবে! থারসেনডাকে সে যে বহু দিন পূর্ব্বে মনে মনে স্বামীর আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে! তবে! অশান্ত বেদনাপ্লুত হৃদয় চাপিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্থির হইয়া দাড়াইয়া রহিল; মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিল,

থারসেনডার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সে একদিনও জীবিত থাকিবে না।

দেশাচার আর একটী মাত্র বাকি ছিল। এইবার বরকে কন্যার মুখাবরণ মোচন করিতে হইবে। পরে কন্যাকে বরের মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া দিতে হইবে; ইহাই দেশাচার, ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই।

যুবক ডরিসের মুখাবরণ মোচন করিয়াই বিস্ময়ে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ডরিস কি করিতেছে তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না; মাত্র ইহাই বুঝিল যে যুবক তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু তাহাতে কি? থারসেনডা ব্যতীত গ্রীসের আরও অনেক যুবক ত' তাহাকে ভালবাসে! শিরস্ত্রাণের বন্ধন খুলিতে ডরিসের হাত কাঁপিতে লাগিল। প্রাণ নব স্বামীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেও দেখিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। অবশেষে ডরিস শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিল। একি! আনন্দের আতিশয্যে ডরিসের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাহার নব নির্ব্বাচিত স্বামীর প্রসারিত বাহুর মধ্যে পড়িয়া গেল। সে যে থারসেনডা,—সে যে তাহারই মনের মতন!